লেডী রম্

পুলকেশ দে সরকার

প্রতিভা-প্রকাশিকা
৩১ স্কট লেন, কলিকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

[illegible]২৯ সালের অগ্নিযুগের বাংলা। ভগৎ সিং-এর ফাঁসী ও যতীন দাসের আত্মাহুতির ফলে বাংলার আকাশ বাতাসে যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সন্ত্রস্ত ও সচকিত ক'রে—সেই যুগে একখানি রোমাঞ্চকর অগ্নিবর্ষী বই আমার হাতে এসে পড়ে—"ফাঁসীর আশীর্ব্বাদ"—লেখক শ্রীপুলকেশ দে সরকার। পরে খবর পেলাম ইনি আমাদের কোচবিহারেরই ছাত্র—শীর্ণকায়, কিন্তু বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন এক যুবক—বিপ্লব-পন্থী। সেদিন থেকেই পুলকেশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে নানা কাজের ভেতর দিয়ে, বিশেষত, কোচবিহারের রাজনীতি নিয়ে নানা অবস্থায় পুলকেশবাবুকে আমি আজ বিশ বাইশ বছর ধরে দেখেছি। আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছি। তাঁর রাজনৈতিক জীবন—তাঁর সাংবাদিক জীবন—ও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে। সাহিত্যিক ক্ষেত্রেও যে তাঁর বিচার বুদ্ধি কত তীক্ষ্ম—তাঁর দৃষ্টি কত সুক্ষ্ম—ও তাঁর লেখনী কতটা সাবলীল তার পরিচয় এই বইয়ের প্রতিটি গল্প বা রচনার ভেতর দিয়ে পাবেন। আরও জানতে পারা যাবে যে এই রাজনৈতিক লেখকের অন্তরে সুক্ষ্ম রস-বোধের প্রাচুর্য কতখানি।

এই বই প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমি তা দেশবাসীর সম্মুখে এই আশায় উপস্থিত করছি যে, তাঁদের কাছেও লেখকের অভিজ্ঞতা-সিঞ্চিত রচনা নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে।

সুচক্র লাইব্রেরী। — তারাপদ চক্রবর্ত্তী

২৯২, রসা রোড, সাউথ কলিকাতা-৩৩।

১৯৩২

বন্ধুবর শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী উদ্যোগী না হ'লে আমার এই লেখা কখনও বইয়ের আকৃতি পেত কিনা সন্দেহ। তিনিই এই বইয়ের প্রকাশক। আর লেখাগুলোর পেছনে রয়েছে প্রধানত 'পূর্ব্বাশা' সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও 'বসুমতী' সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের উৎসাহ এবং আরও অনেকের।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন আমার কোচবিহারের আবাল্য কনিষ্ঠোপম সুহৃদ শ্রীসুধীর কুমার গুহ মজুমদার।

ছেপেছেন—শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত পূর্ব্বাশা লিমিটেড,
৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা।

বেঁধেছেন—পূর্ব্বাশা লিমিটেড।

মূল্য তিন টাকা

উৎসর্গ

১৯৩০। ধুবড়ী। গৌরীপুরের মাঠ ঘিরে ফেলেছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। মিলিটারী অদূরে মোতায়েন। লাঠিয়াল পুলিশদল নামল মাঠে। ছোট্ট লোক-সভার ওপর চল্‌ল বেপরোয়া প্রহার। আহতের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনি। আমি আঘাতে অচৈতন্য। কোথায় শক্ত মুঠির জাতীয় পতাকা? এই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মা। তাঁর স্নেহাঞ্চল আমাকে আগলে জাতীয় পতাকার মতো আন্দোলিত হ'তে লাগল। ভবিষ্যতের পথে পড়ল রক্ত রেখার ইঙ্গিত।—পুলক

লেডী রস্

রঙিন শার্শির ভেতর দিয়ে তির্যক গতিতে সূর্যের স্পেক্‌ট্রাম এসে পড়েছে লেডী রম্‌-ওরফে লেডী রমলার চোখে। লেডী রম্‌ এই ঘরটায় শোন্‌, এই পূবের ঘরটায়, একেবারে পূব কোণে, যেখানে দালানের পূর্বান্ত। ঘরটা একেবারে ছোটো নয়। মুসলমানের তাড়া-খেয়ে-আসা পাঁচটা উদ্বাস্তু-পরিবার পঁচিশটা ছোট-বড় লোক নিয়ে বসতি বাঁধতে পারে। একটু ঘিঞ্জি হবে, কিন্তু ফাঁকা গ্রামে মুসলমানের তাড়ার ভয় নেই।

এ ঘরে জানালা একটাও নেই। মেঝে থেকে ছাদ অবধি যতগুলো কবাটওলা আলো-হাওয়া আগমন-নির্গমনের অবকাশ আছে তাদের সব ক'টাই দরজার সংজ্ঞায় পড়ে। এমন আটটা দৈত্যের মতো ঢেঙা আর মারোয়াড়ীর মতো স্থূলকায় অবকাশ আছে এই ঘরটায়; কিন্তু বাইরের আকাশ আর ভেতরের আকাশের মাঝে ব্যবধান রচনা করেছে নানা বর্ণাঙ্কন-বিচিত্র শার্শি। পুলিতে টানা হাল্কা নীল রঙের পর্দা আছে গুটানো দরজাগুলোর মাথায় মাথায়, দরজাগুলোর বাইরে বাইরে গোলাকৃতি দু'খানা ভেনেস্তা চেয়ার-পাতা রেঁদেভ্যুর বিচ্ছিন্ন বারান্দা।

পাঁচটা পরিবারের ঘিঞ্জি হয়ে পুনর্বসতি হতে পারে পূব কোণের এই ঘরটায় মাত্র একটি সোফা, স্প্রিংয়ের প্যাঁচে ওঠা-নামা করতে পারে, আর রাবারের নরম চাকায় পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ করতে পারে, আর পারে এতে দু'-দু'টো মানুষ অনায়াসে বসতে, শুতে এবং গল্প করতে।

কিন্তু এ ঘরে লেডী রম্ শোন্ একা এবং এর পশ্চিম দরজার বাইরে লেখা আছে রিট্রিট, যার সোজা বাংলা হচ্ছে সংসারের হট্টগোল থেকে পলায়ন। লেডী রম্ পালান, পঁয়তাল্লিশ বছরের লেডী রম্ প্রায়ই পালান, বছরে দু'শো দিনই পালান এবং লিফ্‌টে-ওঠা তেতলায় পঞ্চাশ বছরের স্বামী স্যার বি, আর মহাপাত্রের পশ্চিম দিক্‌কার ঘরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখেন—এক্সটেন্‌সান থ্রি। আর এ ঘরে একা থাকেন লেডী রম্—যে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মসৃণ আয়না, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে পরিব্যাপ্ত, চোখ বুজলেও লেডী রম্ অনুভব করতে পারেন তিনি কেমন করে শুয়ে আছেন এবং তাঁকে কেমন দেখাচ্ছে, রেডিয়ামের মতো অন্তর্ভেদী মুখস্থ দৃষ্টি। একটু চোখ খুললেই মাংসাবৃত য়্যানাটমির সুতীক্ষ্ণ রেখা রেটিনায় প্রতিফলিত হয় আর লেডী রমলার চিত্তে সেই ছবি ছাপা হয়ে যায়। পলকে পলকে নিজের এই চলচ্চিত্র দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে লেডী রমলার নিজেকে।

অত্যন্ত ভাল লাগে, বড় ভাল লাগে লেডী রমলার নিজেকে। তাঁর শোয়া-বসা-গড়ানো সব-কিছুই কেমন শিল্পশ্রী-মণ্ডিত, কেমন ওড়া-ওড়া শুকনো অলকদাম, পাকা চর্বিতে ফাঁপানো মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল কর্ণজোড়ের সামীপ্যপ্রার্থী কৃষ্ণকলি ভ্রূযুগল, আভিজাত্য স্পর্ধোদ্ধত খানিকটা বোঁচা নাক, সিগারেটের ধোঁয়ায় লাঞ্ছিত কালো পুরু ঠোঁট, দৃঢ়তায় কঠিন দু'টি নিষ্কলঙ্ক কপোল, স্বল্প দৃশ্যমান সামান্য ভেতো লোমে আস্তীর্ণ মুঠো-ভর্তি থুৎনি। এর পর নেমেছে গ্রীবা,

এসে থেমেছে সুডৌল স্কন্ধে, যে স্কন্ধে কখনও কোন ভার নিতে বা বইতে হয়নি। ৪৫ বছরে যৌবন গিয়েছে রমলার কিন্তু স্বাস্থ্য আছে, নিটোল স্বাস্থ্য, কোমলতা না থাকলেও স্নেহাধিক্য আছে যে স্বাস্থ্যে। সোজা আয়নাটায় দেখা যায় লেডী রমলার সুপুষ্ট দেহ, নানা ভঙ্গীতে শায়িতা। হাঁটু-ভেঙে শুলেও মন্দ দেখায় না, ঠিক ততখানিই ভাল দেখায় চিৎ হয়ে সব শরীরটা টান-টান করে শুলে অথবা আধ-শোয়া অবস্থায় না-পড়া মাসিকখানা নিয়ে আলস্য ভাঙলে যতখানি ভাল দেখায়। যে ভাবে যে ভঙ্গীতেই হোক্ না কেন, দেয়ালের আয়নায় নিজের রূপভঙ্গিমা দেখে দেখে লেডী রমলার আশ আর মেটে না। খুব ভালো পটুয়াকে দিয়ে আঁকানো আর তেমনি পটু ক্যামেরা-ম্যানকে দিয়ে তোলা গোটা কয়েক বড় বড় ফোটো টাঙানো আছে এ-ঘরে ও-ঘরে এবং এ-বাড়ীর যেখানে যেখানে বিচরণ করেন লেডী রম্। বন্ধুবান্ধবকে টেনে নিয়ে দেখান ছবিগুলো, বার বার তাদের মত জিজ্ঞাসা করেন আর ভবিষ্যতে আবার কি ভঙ্গীতে ছবি তুলবেন ভাবতে থাকেন। লেডী রম্ নিজের রূপের মাঝখানে জাগেন, নিজের রূপের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েন। ৪৫ বছরের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা লেডী রম্। প্রসাধনে প্রসাধনে ঘর্ষণোজ্জ্বল ৪৫ বছরের পরিমিত চর্বি-পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যশ্রী লেডী রম্।

তির্যক গতিতে রঙিন শার্শির ভেতর দিয়ে সূর্যের স্পেক্‌ট্রাম এসে সদ্য সুপ্তোত্থিত লেডী রমলার উন্মীলিত চোখে পড়তেই আজ এই ১৩ই তারিখে অকস্মাৎ তাঁর একটা

কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের গ্লানিতে শেষ সুপ্তির জড়তাও সম্পূর্ণ কেটে গেল। ঝট্‌কা মেরে উঠলেন লেডী রম্‌, দেয়ালের আয়নাগুলোতে অপরূপ ভঙ্গী তড়িতায়িত হল যেন, নিজের রূপ-ছায়ার দিকে তাকাতে তাকাতেই খাটের ডান বাজুতে বৈদ্যুতিক কল টিপ্‌লেন, রিট্রিটের পশ্চিম দরজার শীর্ষে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল, আর ঘন্টি কির্‌-কির্‌ করে বেজে উঠল। ঐ বুক-কাঁপানো শব্দ এতটুকুও শোনা যায় না রিট্রিটের ভেতরটায়। কিন্তু দুয়ারে দাসী সুশীলা প্রস্তুত, বুক-কাঁপানো কির্‌কিরানি থামতেই ভারী দরজাটা খুলে ঢোকে এই ঘরে···

দেয়ালের আয়নার দিকে তাকিয়েই বলেন, সুশীলা, শীগ্‌গির খুলে দে তো আমার পুতুলের ঘরটা। ইস্‌, কদ্দিন হয়ে গেল যাইনি পুতুলের ঘরে, তোরাও এম্‌নি হয়েছিস্‌···

সঙ্গে সঙ্গে চাবির গোছাটা নিয়ে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়ায় মূক সুশীলা, কর্ত্রীর মনের কথা মনে করিয়ে দিলে বা না দিলে দোষের পার্থক্য ওজন করতে পারল না কিছুতেই বারো বছরের পুরানো ঝি সুশীলা। মনের কথা টেনে বলা চলে কর্ত্রীর?—না, না-বলাটাই শোভন? এ কথাটা একবারও কি মনে করিয়ে দিতে নেই রে, আর, তোর এ সব কথায় মাথা ঘামাবার দরকারটা কি, এ দু'য়ের পার্থক্য আজও বুঝতে পারেনি সুশীলা—কৃত্রিম প্রচেষ্টায় স্বভাব-মুখর মূক সুশীলা।

চাবির গোছাটা নিয়ে সুশীলা পৌঁছোয় পুতুলের ঘরের

কাছে, চপল গতিতে তালা খুলে ফেলে, আর প্রায়-বিস্রস্ত বসনে আসেন লেডী রম্, তর্ সয় না লেডী রমলার, কি একটা অন্যায় অনুভূতি জেগেছে ওঁর মনে। তালা-খোলা দরজাটা আধ-ভেজানো থাকতেই দড়াম্ করে ভেতরে ঢুকলেন, পুট্ করে আলো জ্বাললেন, জানালাগুলো সুশীলাকে খুলে দিতে বল্লেন, হুতাশে ছুটে গেলেন তাকের কাছে, তেমনি উদ্দামতার সঙ্গে তাক থেকে নামালেন এক পুতুল, কালপ্রবাহের কোন বিস্মৃত মুহূর্তে তাঁর তাকে-তোলা পুতুল, পরম আদরে ঝাড়তে লাগলেন ধূলো-নিরোধী ঘরে নির্ধূল পুতুলের অঙ্গ-ধূলি, তার পর তেম্নি আবেগের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, ইস্, তোরা কি রে, একবারও কি মনে করিয়ে দিতে নেই রে, কত দিন কেটে গেল আমার পুতুলমণির অনাদরে। তোদের কাউকে আর রাখব না কাজে।

গাটাপার্চারের রঙিন পুতুলের ফোলা-ফোলা গালে লেডী রমলা চুমো খেলেন। নিউ মার্কেটে স্বামী স্যার মহাপাত্রের সঙ্গে কেনা গাটাপার্চারের রঙিন পুতুল, গ্ল্যাকসোর বিজ্ঞাপনের মতো ড্যাবা-ড্যাবা হাত-পা আর চক্‌চকে ন্যাড়া মাথার এত বড় পুতুল, প্রাণ থাক্‌লে কম্‌সে-কম দেড় বছর বয়স হ'ত। প্রাণ না থাক্, তুই বাক্স দরজি দিয়ে তৈরী নানা ঢঙের জামা—মায় হাওইয়ান সার্ট আছে। আছে শান্তিপুরী কাপড়। এক পাশে কাঠের ঘোড়া, আর এক পাশে মোটর গাড়ী, আরও কত কি খেলার সামগ্রী। প্রাণ না থাক্, তাতে লেডী রমলার কথা বল্‌তে বাধে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর সঙ্গে বুলবুলির মতো

কথা বলে যেতে পারেন লেডী রম্, এই মূক সুবোধ বাধ্য ছেলেটিকে বড় ভাল লাগে লেডী রমলার, যা ইচ্ছা তাই চরিতার্থ করতে পারেন, নির্বিকার পুতুল। তবু লেডী রম্ বলেন, তুমি যে কিছু বল্ছ না খোকন, বল্তে চাও না বুঝি, বল্তে ভাল লাগে না বুঝি, শরীর খারাপ? তবে এসো, একটু ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেয়ে এসো। ও মা! এই রোদে ঘোড়ায় চড়ে যাবেই বা কোথায়। নাও, মোটর চড়ো, নাঃ, এবার খোকনকে একটা নিউ মডেল কিনে দিতেই হবে। আজই।

অনর্গল বলে যেতে পারেন লেডী রম্। সত্যি, কত কথা আছে এই পৃথিবীতে। বল তো খোকন, আজ জল হবে কি না, না, ঝড় হবে। যাই হোক্, বলেই গান ধরেন, ফিরব নাকো আর, মোদের যাত্রা হ'ল সুরু···

গাইতে একটু একটু পারেন লেডী রম্। স্যার মহাপাত্রের স্ত্রী হবার পর একবার তদ্বির-তদারক করে একটা গান রেকর্ড করার আয়োজনও হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি একটা যান্ত্রিক গোলমালে আর তোলা হয়নি। অভিমানবশে লেডী রম্ আর রেকর্ড তো করানই নি, বাড়ীর রেকর্ডগুলো ভেঙেছেন, নূতন রেকর্ডও কেনেননি। নিউ মার্কেটে স্বামীর সঙ্গে কেনা গাটাপার্চারের খোকনকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে কোম্পানীকে জব্দ করাবেন ভেবেছিলেন লেডী রম্, কিন্তু খোকার মৌনভঙ্গ হয় না কিছুতেই।

নির্ধূলি অঙ্গের ধূল ঝেড়ে পুতুলের অঙ্গ থেকে এত দিনকার

বাসি কাপড় নিলেন ছাড়িয়ে, তার পর হ্যাড়া মাথায় দিলেন সামান্য একটু বাথগেটের তেল, তার পর নিয়ে বসালেন ছোট টাবটায় আর ঠিক মাথার ওপরকার ছোট্ট ঝরণা-টেপকল দিলেন ছেড়ে, লাক্স গুলে সাবান দিলেন গায়ে, তার পর নিয়ে এলেন আদর করে টাবের বাইরে, শুকনো তোয়ালেয় নির্জলা করে মুছলেন। নিজের গায়ে হাই ব্লাড-প্রেসারের গরম দিয়ে বুঝলেন, খোকনের গরম সহ্য হচ্ছে না, নাই বা জামা গায় দিলে এখন খোকন, যা গরম। একটা বরং ইজের পর। হ্যাংটো থাক্‌তে নেই, লোকে নিন্দে করে। ব্যস্, এবার পাখার নীচে এই চেয়ারটায় বাবু হয়ে বসো। বাঃ, সুন্দর, সোনা!

সুশীলাকে ব'লে ড্রাইভারকে দিয়ে আনালেন সেন মহাশয়ের সন্দেশ। লুচি ভেজে দেব দু'খানা? না, এই থাক, বরং এক কাপ দুধ খাও। অনেকটা বেলা গড়িয়ে গেছে, দুপুরের ভাত খাবে কখন?

অনেক যত্নে ছোট্ট বিছানা করলেন খোকনের; দু'দিকে দুই পাশ-বালিশ। খোকনের আবার পাশ-বালিশ চাই, এমনি বদ্ অভ্যেস। পড়েও তো যেতে পারে। আজ কি খুব মশা? থাক্ মশারিটা চাঁদোয়া করে তোলা।

কলের পাখায় কুলোয় না যেন খোকার। হাঁটু গেড়ে খস্‌খসের পাখা নিয়ে বসেন লেডী রমলা। খুব কি ক্ষিদে পেয়েছে খোকার? অত হাভাতেপনা করো না খোকা। এই তো খেলে, এক্ষুণি খেলে অসুখ করবে যে। সুশীলা গেছে খাবার জোগাড়ে। সুশীলাকে ডাকলেন। বৈদ্যুতিক জগতে

দূরের লোককেও কাছে ডাকতে দেরী হয় না। সুশীলা তো ঝি। সঙ্গে সঙ্গে সুশীলা এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে লেডী রম্ তিরস্কার করে উঠলেন। হ্যা রে, তোদের কি আক্কেল নেই রে! সেই সাত-সকালে খেয়েছে খোকন দু'টি এতটুকু-টুকু সন্দেশ আর এক কাপ দুধ। কতক্ষণ থাকে? বলি, রান্না কি তোদের এ জন্মে হবে না?

পরিষ্কার করে মুখ মুছিয়ে দিলেন খোকনের, ভেজা গামছা দিয়ে আর একবার মুছে নিলেন গাটাপার্চারের রঙিন পুতুলের নির্ধূল অঙ্গ। তার পর আদর করে শুইয়ে দিলেন। হাওয়া করলেন খস্‌খসের পাখায়। আওড়ালেন ঘুম-পাড়ানিয়া গান। ঘুমিয়ে পড়ল বুঝি খোকন। তার পর ঝট্ ক'রে দরজার বাইরে এলেন। বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে। সুশীলাকে আদেশ দিলেন, ঘরটা পরিষ্কার করে গাটাপার্চারের পুতুলটাকে তাকে তুলে রাখতে।

দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের পর বৈকালিক প্রথম জাগরণে লেডী রম্ ডাকলেন সুশীলাকে। জানতে চাইলেন, রমেনকে আনতে ড্রাইভার গেছে কি না। রমেন। লেডী রমলার শিল্পী। লেডী রমলার পাঁচ রকমের তেলে-আঁকা ছবি এঁরই শৈল্পিক কৃতিত্ব, রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তোলে সে লেডী রমলার অগাধ সৌন্দর্য্য। রমেনের হাতে অদ্ভুত খেলে রঙ, অদ্ভুত চলে তুলি, অদ্ভুত তরল আইডিয়া। খুব অল্প ক'দিনের উপবেশনেই আঁকতে পারে সে লেডী রমলার কঙ্কালের ওপর মাংসের সঞ্চয়। এমনি মুখস্থ হয়ে গেছে লেডীর দেহ-কোণগুলি

রমেনের। খানিকটা স্নেহ, কিছু মমতা এবং অনেকখানি ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে এই এতবার করে আঁকা দেহ সম্পর্কে, বেশ ভালো লাগে রেখাগুলি, অনেক দিনকার লালন-করা তুলিতে বুলানো রেখা, লেডী রমলার দেহ-রেখা। শিল্পীর মতো অষ্টকোণী পাঁস্‌নে চশমা পরে রমেন, আর কেমন ঘোলা-ঘোলা দৃষ্টিতে তাকায়, আল্‌গোছে রঙে তুলি ছোপায়, তার পর মারে ক্যান্‌ভাসে টান, দুর্দ্ধর্ষ টান। টানে টানে ফুটে ওঠে রেখা, লেডী রমলার দেহ-রেখা। তার পর এক দিন জ্বল-জ্বল করে ওঠে রূপ আর রমেনের হাতে রূপা। শিল্পীর মতোই চীনাংশুক আর মুগার জামা ছাড়া গায় দেয় না রমেন, আর, তাঁতের কাপড় ছাড়া পরে না শিল্পী রমেন, পায়ে দেয় না পাম্প-সু ছাড়া কোন জুতো।

শিল্পী রমেন সাহা। বৈঠকখানা রোডের এক হাতায় দু'খানা ঘরের বাড়ী, ভাড়াটে বাড়ী। বিয়ে-করা স্ত্রী, দু'টি বৈধ কন্যা। দু'খানা ঘরের একখানা ঘরে শিল্প, অপর ঘরে সংসার। বাড়ীওলার কৃপার দান এক কোণে এক চিল্‌তে রান্না-ঘর। ছত্রিশের দুইয়ের একের এ। মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায় লেডী রমলার ঝক্‌ঝকে গাড়ী বৈঠকখানার ঐ হাতার মোড়ে। ড্রাইভারকে ভেতরে এসে ডাকতে হয় রমেনকে। লেডী রমলার ড্রাইভার, চাট্টিখানি কথা নয়, নিঃশব্দে ছত্রিশ মাইল বেগে সে গাড়ী চালায় এই এঁদো গলিতেও, আর ঘ্যাস করে ব্রেক কষে হতভাগা পথচারীর একেবারে পায়ের গোড়ালির কাছে, লাফ দিয়ে ওঠে পথচারী, ড্রাইভার আবার

ছত্রিশ মাইল বেগে আর এক জনার গোড়ালির কাছে হুড়মুড়িয়ে পড়ে, কেউ তেড়ে আসার সাহস করার আগেই সে তেড়ে ওঠে আর ভক্ করে হর্ণ দিয়ে গাড়ী চালায় ছত্রিশ মাইল বেগে। ওরা জানে পুলিশ কখনো ওদের ধরবে না, ওরাই ধরবে পুলিশকে, নয় তো দু'জনেই গলা-ধরাধরি চলবে ছত্রিশ মাইল বেগে। লেডী রমলার ড্রাইভার। ছত্রিশ মাইল বেগে বৈঠকখানার হাতায় এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে, আটত্রিশ মাইল বেগে দরজা খুলে বেরোয়, চল্লিশ মাইল বেগে ছত্রিশের দুইয়ের একের এ নম্বরে এসে বেয়াল্লিশ মাইল বেগে আধা-খোলা কড়া নাড়ে, চুয়াল্লিশ মাইল বেগে হাঁক দিয়ে শিল্পীর সাক্ষাতে আটচল্লিশ মাইল বেগে তাগিদ দেয়। রমেনের যত দেরী হয় ততই সে পঞ্চাশ মাইল বেগে হর্ণ টিপতে থাকে আর অনভিধানিক নানা রকমের শব্দ প্রয়োগ করতে থাকে জোরে জোরেই—শিল্পীই তো, লেডী রম্‌বা স্যার মহাপাত্র তো নয়। একেবারে স্কুলে-না-যাওয়া বিদ্যেয় ইংরিজী শব্দেও উষ্মা প্রকাশ করে।

তবু আসে মাঝে মাঝে এই গাড়ীখানা এই বৈঠকখানা রোডের হাতায়। কবে আসবে তার কোন ঠিক নেই। গণক দিয়ে হাত গুণিয়েও ঠিক করা যায় না। শিল্পী রমেন নিজের উদ্যোগেই কোন-কোন দিন গেছে ট্রামে আর হেঁটে অত বড় বাড়ীটায়। বৈঠকখানায় পাঁচ-সাতটা চাকর-ঝিকে দিয়ে ওপরে খবর দেবার পর কেউ একবার তর্‌তর্‌ করে নেমে এসে জানিয়েছে, মা বল্লেন, আজ তিনি বড্ড ব্যস্ত। মা

বললেন, আজ আর তিনি বসবেন না ছবি আঁকাতে। মা বললেন, শরীরটা খারাপ, ডাক্তার এক্ষুণি আসবে। অথবা মা তো বেরিয়ে গেছেন। রমেন ঠিক মনে করতে পারে না, তাকে লেডী রম্ অথবা কেউ আসতে বলেছিলেন কি না। নিজেকে কেমন মিথ্যে মনে হয় শিল্পীর কিন্তু তবু পাঁসনেঁ-পরা ঘোলাটে চোখে স্থায়ী অভিমান ঘুলিয়ে ওঠে না শিল্পী রমেনের। আকস্মিক আহ্বান পেলে কেমন চরিতার্থ হয়ে যায় রমেন, গায়ে-পায়ে যেন বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য অনুভব করে। অত তাগিদেও বিস্তর প্রসাধন করতে ভোলে না, ভোলে না বেরোবার আগে বার বার সকালে-কামানো ভাঙা চোয়ালের মুখখানা দেখতে। ডাক এসেছে, এই একটি আনন্দেই অত্যন্ত সহজে রমেনের বাষ্পাভিমান বিলীন হয়ে যায়। প্রবল আগ্রহে লিফটে করে উঠে যায় লেডী রমলার রিট্রিট পর্যন্ত।

কোন কোন দিন কোন আয়োজনের ত্রুটি থাকে না অভ্যর্থনার। গেটের দারোয়ান সম্প্রসারিত করে দেয় দরজা, লিফটম্যান জানায় স্বাগতম, আর ওপরে সুশীলা বলে, আসুন।

আজ কিন্তু লেডী রমলা নিজেই দাঁড়িয়েছিলেন লিফটের মাথায়। লিফটের কোলাপসিবল দরজাটা খুলতেই লেডী রমলা হাত ধরে টেনে নিলেন শিল্পী রমেনকে। ইস্, এত দেরী করলে। খুব কষ্ট হয়েছে, না? বাপস্, যা গরম। রাস্তাগুলো যেন তেতে থাকে। মোটরে বসাই যায় না এ সময়। একেবারে ঘেমে গেছ দেখছি। নাও, জামাটা খোল। বোসো এই পাখার তলায়। ঘামটা একটু মরুক। ভেজা

তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেব, একটু আরাম পাবে। বোসো তুমি। চুলে কি তেল দিয়েছ? সুন্দর চুল তোমার। হাওয়া লাগছে তো পাখার? দাঁড়াও আর একটু বাড়িয়ে দি।

ছত্রিশ মাইল বেগে ঘুরতে লাগল পাখা শিল্পী রমেনের মাথার ওপর। তোয়ালেটা ভিজিয়ে নিলেন টেপকলের জলে লেডী রম্, তাতে ঢাললেন একটু ল্যাভেণ্ডার, সমস্ত ঘরটায় চঞ্চল হাওয়ার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল একটা মিষ্টি সুগন্ধ, ভেজা তোয়ালেটা নিয়ে নিজে এগিয়ে এলেন লেডী রম্; একটা গোটা বাহু তুলে নিলেন রমেনের, মার্জনা করলেন ল্যাভেণ্ডার-মাখা ভেজা তোয়ালে দিয়ে।

বিব্রত রমেন বল্‌ল, এ কি করছেন, ছি, আমাকে দিন, আপনি কেন···

বল্‌লেন লেডী রমলা, তুমি শিল্পী, তুমি অসাধারণ, তোমরা যে শ্রদ্ধেয়, তোমার লজ্জা কি?···

আর একখানা হাত তুলে নিলেন রমেনের, মার্জনা করতে করতে মৃদু গুঞ্জনে গাইলেন, কে জানিত আস্‌বে তুমি অনাহূতের মতো···

অনাহূত? ঘোলাটে চোখে রমেন জিজ্ঞেস করল।

লেডী রম্ গাইতে লাগলেন, কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না।

রমেন জানতে চাইল, চোখের জলে কি এই তোয়ালে-খানাও ভিজত?

·· তোমায় পথের কষ্ট দিলেম গো···

রমেন তবু বল্‌ল, ভুলে গেলেন, আমি মোটরে এলাম।

লেডী রম্ বললেন, থাক্, কথাশিল্পী হয়ে আর কাজ নেই, যে শিল্পী আছ, তাই থাক।

মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে অকস্মাৎ মন্তব্য করলেন স্বাস্থ্য-সুন্দরী লেডী রম্, ইস্, বড্ড রোগা তুমি।

গামছাটা রেখে এলেন আলনায়। বললেন, হ্যাঁ, শোনো, যে জন্য তোমায় ডাকা। দাঁড়াও, তোমার সরবৎ করে দি।

বাড়ীতে পাঁচটা ঝি আর সাতটা চাকর থাকতেও নিজ হাতে সরবৎ তৈরী করলেন লেডী রম্ ছত্রিশের ছুইয়ের একের এ বৈঠকখানা রোডের ত্রিশ টাকা ভাড়াটে শিল্পী রমেনের জন্য। সরবৎ এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাবারটা যাবার সময় খেও। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, শোনো, আমি আর একটা সীটিং দেব, আমার আর একটা···একটু হাল্কা রঙের ওপর, টাঙাবো ঐ রিট্রিটের দরজার মাথায়, কেমন হবে বল দেখি, না, না, বসে নয়, দাঁড়িয়ে, ফুল ফিগার। না, অত দিন লাগলে চলবে না, খুব জোর তুলি টানতে হবে। ও মা, তোমার কি অসুখ করেছিল না কি রমেন? সরবৎটা মিষ্টি হয়েছিল তো? খাওয়া-দাওয়া সময় মতো করো না বুঝি? যখনই ক্ষিদে পায় তখনই খাও তো? চোখের কোণে কেমন কালি পড়ে গেছে তোমার, নাও, চশমাটা খোলো তো, দাঁড়াও, তোয়ালেটা আর একবার ভিজিয়ে নি।

আর একবার ভিজিয়ে নিলেন তোয়ালে লেডী রম্, আর তাতে ঢাললেন কয়েক ফোঁটা ল্যাভেণ্ডার। ভুর-ভুর করে

ছড়িয়ে গেল মিষ্টি সুগন্ধ সারা ঘরটায়। পরম আদরে মুছে দিলেন চোয়াল-ভাঙা শিল্পী রমেনের মুখখানি লেডী রম্ নিজ হাতে। নিয়ে এলেন পাউডারের পাফ্, ঝুরঝুরে পাউডারে আচ্ছন্ন করে দিলেন শিল্পী রমেনের চোয়াল-ভাঙা মুখখানি, অভিভূত, মোহাবিষ্ট হ'য়ে গেল রমেন লেডী রমলার পরিচর্যায়। শিল্পীর মনে শত শত বুদ্‌বুদ উদ্ভূত হ'য়ে মহা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে লাগল মগজে। লেডী রমলার অতি-সামীপ্যের ঘ্রাণ এসে বার বার তরঙ্গ তোলে নাসারন্ধ্রে, পাৎলা চিরুণী নিয়ে আসেন লেডী রম্, আল্‌গোছে উল্টে-পাল্টে সীঁথি কেটে দেন শিল্পী রমেনের কাঁচা-পাকা কেশারণ্যে, সাপের বাঁশী শুনে শিল্পী রমেনের চিত্ত ফণার মতো তুল্‌তে থাকে। পাঁসনে চশমার নীচে ঘোলাটে চোখে তাকায় শিল্পী রমেন, লেডী রমলার চর্বির ঠাসায় টানা-চামের সুগোল বাহুতে ভাড়াটে রমেনের কর্কশ পাণির স্পর্শ পড়ে।

তুমি হাত দেখতে জান, রমেন? পাঞ্জা কষ্‌তে? পার না বুঝি? পারবে কি, যে রোগা তুমি! বোসো, তোমার খাবার আনি। কি খাবে? সন্দেশ? নোন্‌তা তুমি ভালবাস না, ভালবাসা উচিতও নয়, তোমার দরকার প্রোটিন।

হাল্কা টিপয়টা নিয়ে এলেন রমেনের সোফার কাছে; নিজে বয়ে নিয়ে এলেন লেডী রম্ বাড়ীতে পাঁচটা ঝি আর সাতটা চাকর থাকা সত্বেও! ছোট কাঁচের আলমারী থেকে বের করে আনেন সেন মশাইর সন্দেশ; একটা বড় ডিসে গুছিয়ে দিয়ে রেফ্রিজারেটর থেকে এক গ্লাস জল নামিয়ে

আনেন। নাও, খাও। ব'লে খানিকটা কাছেই হাঁটু গেড়ে বসেন। মাথার ওপর বৈত্যুতিক পাখা থাকা সত্ত্বেও হাতের চন্দন পাখাটা নাড়তে-নাড়তে বলেন, আবার কবে আস্‌বে বলো। আস্‌ছে শুক্রবার, না, রোববার? রোববার? মঙ্গলবার এলেও পার। মঙ্গলবার আস্‌বে তো? কখন আস্‌বে? না, সকালে নয়। তুপুরে আস্‌বে? বাপস্‌, তুপুরে যা রোদ। তুমি বিকেলেই এসো। সন্ধ্যে হলে আরো ভাল। ধর ছ'টা। না পার, সাড়ে ছ'টা। ঠিক সাড়ে ছ'টা। আমি ঘড়ি ধরে থাক্‌ব। ঠিক সাড়ে ছ'টা। মনে থাক্‌বে তো, না, ভুলে যাবে? শিল্পীর মন! না, মনে রাখতেই হবে। ঠিক এসো কিন্তু সাড়ে ছ'টা।

লিফট্‌ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন লেডী রম্‌! ভুল্‌বে না তো কিছুতেই রমেন? সেদিন থেকেই নূতন সীটিং স্নুরু হবে। তোমার আসা চাই-ই রমেন, ভুল্‌বে না কোন মতেই, বুঝলে, তোমায় সেদিন চাই। বিচ্ছেদের বেদনা আর অভ্যর্থনার আবেগ অঝোরে ঝরতে লাগ্‌ল লেডী রমলার কণ্ঠাবেদনে। শিল্পী রমেনের ভাবপ্রবণতায় শুধু এই ভাবটাই বুদ্‌বুদ কাট্‌তে লাগল যে, মঙ্গলবার সকালে নয়, তুপুরে নয়, সন্ধ্যা ছ'টায় নয়, ঠিক ঠিক সাড়ে ছ'টায় তার আসাই চাই লেডী রমলার "রিট্রিটে", নইলে, কে জানে, লেডী রমলা মা—রা যা-বে-ন।

মঙ্গলবার অনেক দিন পর গড়িয়ে এল, একান্ত কূর্মগতিতে আবির্ভূত হ'ল শিল্পী রমেনের ভাড়াটে ঘরে। শিল্পী শৈল্পিক দৃষ্টি ও নৈপুণ্যে দেহ ও পরিবেশ মার্জনা করল সারা দিন।

উবুড়-করা জাপানী টাইমপিসটা অনেক বার তুলে তুলে সময়ের টুক্‌রো বা টুক্‌রো-টুক্‌রো সময় দেখল—উবুর-করা জাপানী টাইমপিস, তিন বছর টুক্‌রো-টুক্‌রো সময় পরিমাপের পর যার আর দাঁড়িয়ে টিক্‌-টিক্‌ করার শক্তি নেই চতুর্থ বছরে। বার বার মাথার ওপর তুলে উর্ধদৃষ্টি শিল্পী রমেন নিরীক্ষণ করছে সময়ের ছোট-ছোট পদক্ষেপ। আর জিন্‌-কষা সবল ঘোড়ার মতো চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—উঠছে শিল্পী রমেন ক্রমশই।

সোয়া ছ'টায় পদাতিকের মতো ঘরের বাইরে প্রথম পদক্ষেপ করল শিল্পী রমেন। আজ আর গাড়ী আস্‌বে না, আজ আকস্মিক আহ্বান নয়, আজ আগে থেকে ব'লে-কয়ে রাখা সম্মিলনের কথা। আজ দায়িত্ব শিল্পী রমেনের ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছোবার। পদাতিকের মতো পা বাড়ালো রমেন। পদাতিকের মতো চল্‌ল রমেন; আর ঘোড়-সওয়ারের মতো তড়াক করে উঠল বাসে। বাস এসে থাম্‌ল মস্ত বাড়ীর কয়েক গজ দূরে, নাম্‌ল চট্‌ ক'রে লেডী রমলার শিল্পী রমেন, বাসের গতি লেগেছে রমেনের রক্তে, সঞ্চালিত হয়েছে তার চলনে। শিল্পী রমেনের গতি সবে এসে থেমেছে গেটের কাছে, এমন সময় গেট গেল তড়িৎ গতিতে দু'ফাঁক হয়ে, আর তেম্‌নি তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে এল ঝক্‌ঝকে একটা বিরাট ভারী গাড়ী, তড়িৎ গতিতেই তা বাঁক নিয়ে রাস্তায় উর্ধশ্বাসে ছুটল। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো গাড়ীর ভেতরে দৃষ্টিপাত হল রমেনের, দৃষ্টির ভুল হয়নি রমেনের কিছুতেই।

শিল্পী রমেনের উবুড়-করা জাপানী টাইমপিসে এখন ক'টা?

শ্রীমতী চারু

মোটরে ওঠার আগে সোনালী প্রান্তের ছ'-ইঞ্চি চার-ইঞ্চি শক্ত সাদা কার্ডখানা আর একবার দেখে নিলেন স্যার কে-কে-রে, হ্যাঁ স্যার কে-কে-রে ; কেননা ওঁর আসল নাম কেউ জানে না, স্যার কে-কে পর্যন্ত ভুলে গেছেন। একতলার প্রহরী স্যার কে-কে'র বাবাও মনে করতে পারেন না স্যার কে-কে-কে তিনি কি বলে ডাকতেন, অথবা স্যার কে-কে কখনো আদৌ শিশু ছিলেন কি না। অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফী জীবনের একমাত্র আনন্দাশ্রয় এই কে-কে-ভিলার একতলার পেছন-দিককার এই ঘরটা, কারো সাক্ষাৎ হ'লে অতীতের গৌরবময় জীবনের গুটিকয়েক অধ্যায় বল্‌তেন ; যতক্ষণ না শ্রোতা হাই তুলে বলত 'আচ্ছা', ততক্ষণ বলতে থাক্‌তেন স্যার কে-কে'র বাবা, হ্যাঁ স্যার কে-কে'র বাবা, কেননা, স্যার কে-কে'র পরিচয়েই তাঁর পরিচয়, পুত্রগৌরবে পিতৃপরিচয় অবলুপ্ত হয়েছে, এই গৌরবেই ভরপুর হ'য়ে আছেন স্যার কে-কে'র বাবা কে-কে-ভিলার একতলার পেছন-দিককার ঘরে। ঐ নিরালা ঘরে নিজের অতীত গৌরবময় কাহিনী মনে করা বা দুঃস্থ উমেদার আত্মীয়-শ্রোতার মনে না হোক কানে ঢেলে দেওয়া ছাড়াও স্যার কে-কে'র বাবার আর একটা কাজ ছিল। একাজ অবৈতনিক এবং স্বেচ্ছানিযুক্ত। স্যার কে-কে যখন ফেরেন অথবা বন্ধের দিনে বিশ্রাম যান তখন হাউণ্ডের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে নীচের বৈঠকখানায় পাহারা দিতে থাকেন

স্যার কে-কে'র বাবা, যাকে এড়িয়ে স্যার কে-কে'র সঙ্গে মোলাকাতের চেষ্টা অসম্ভব। লেডী কে-কে'র বান্ধবীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে, সিঁড়ি বেয়ে তাঁদের ঊর্ধ্বগতি অবাধ, নিঃশব্দ নিউ-মডেলে তাঁরা আসেন, মোটরের বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁরা বেরোন, ক্ষণস্থায়ী ফাটল্ ঘুপ ক'রে বন্ধ হ'য়ে যায়, হাইহিলগুলো টক্ টক্ করে উঠে যায়, সঙ্গিনী থাকলে কণ্ঠে কলকাকলী, সোজা লেডী কে-কে'র···হ্যাঁ, লেডী কে-কে, অনাদি কাল থেকে লেডী কে-কে, অন্তকাল পর্যন্ত লেডী কে-কে, স্ত্রীলোক নয়, নারী নয়, মহিলা নন, শ্রীযুক্তা বা শ্রীমতী নন, লেডী কে-কে অথবা রে।

সেই লেডী রে'র রেজিষ্টার-করা স্বামী স্যার কে-কে-রে সোনালী প্রান্তের ছ'ইঞ্চি চার-ইঞ্চি সাদা কার্ডখানার ওপর একটু বিদ্যুত-দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন; অনুষ্ঠানটি আজই বটে, ঠিক সাতটায়। এখন সাড়ে ছ'টা। চারুকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে মিসেস এন সি বটব্যালের প্রীতি-সম্মেলন। উপলক্ষটা যাই হোক, মিসেস্ এন সি বটব্যালের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সাধ্য কেবল স্যার কে-কে'র নয়, কোন আই-সি-এস্-এরই নেই। কারবার, অর্থ, প্রতিপত্তি এবং মন্ত্রীর মন্ত্রণাদাতা মিঃ এন সি বটব্যাল, কিন্তু অম্লান সৌন্দর্যের মাথা-ঘুরানো বাক্-কলা মিসেস বটব্যালের একান্ত নিজস্ব। পূরাকালে শিব ছাড়া যজ্ঞ হ'ত না একথা নিতান্তই সেকেলে, কিন্তু মিসেস এন সি বটব্যাল ছাড়া প্রীতিসম্মেলন হ'তে পারে একথা অতিবিদগ্ধ সমাজের কল্পনাতীত। খাঁটি ইউরোপীয় গবর্ণেসের শিক্ষায়

শিক্ষিতা, পিয়ানোয় টিউন-করা কোকিলা উচ্চারণপটু এবং স্বয়ং ইউরোপীয় সঙ্গীত ও নৃত্যে সুদক্ষা এবং আবিবাহ খাঁটি ইউরোপীয়দের বাড়ী খাঁটি বিলিতী উপঢৌকন প্রেরণে অভ্যস্তা মিসেস বটব্যাল নিঃ ভাঃ চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে চা দেবেন অথবা 'ভোজ' দেবেন এ-সমাজে এর চাইতে আর্কষণীয় বস্তু কিছু হতে পারে না এবং তাতে অনুপস্থিত থাকার অপরাধ মার্জনা করতে পারেন না স্যার কে-কে-রে, নিজেরও নয়। তাই কার্ডখানা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন স্যার কে-কে-রে।

সব চাইতে ভাল ছাপাখানার ছাপা, সব চাইতে হাল-ফ্যাসানের সোনালী প্রান্তের আইভরি ফিনিশের কার্ড, সব চাইতে ভাল কালিতে ছেপে সব চাইতে ভাল সোনালী ছড়িয়ে দেয়া এবং তার ভেতর সব চাইতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মিসেস এন সি বটব্যালের সোনালী স্বাক্ষর। এত বড় একখানা সাদা এনভেলাপ নষ্ট করে তাতে ভরে দিয়েছেন কার্ডখানা যেন না বাইরের অঙ্গুলিস্পর্শে তা কোনরকমে কলুষিত হয়। এত বড় এনভেলাপে এত বড় কার্ডখানা স্বয়ং মিসেস এন সি বটব্যালই ভরে দিয়েছেন এমন না হওয়ারই ষোলো আনা সম্ভাবনা, তবু স্যার কে-কে এবং লেডী কে-কে'র মনে হয়েছিল এতে মিসেস্ এন সি বটব্যালের ম্যানিকিউর-করা মসৃণ আঙুলগুলির স্পর্শ আছে। যেতেই হবে; ছুদিন হল স্যার কে-কে'র শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, তবু যেতে হবে। কালো কুচকুচে সব চাইতে দামী এবং পৃথিবীর এই

অংশে বিরল একটি পুরো স্যুট এঁটেসেঁটে বস্‌ল স্যার কে-কে'র সর্বাঙ্গে, গলার কাছে সাদা জামার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কালো প্রজাপতিও স্যার কে-কে'র হাতে ভর্ করে উড়ে এসে বস্‌ল—বো !

ঘরের ওপাশটায় আর একখানা পূর্ণাবয়ব আয়না আর আবলুস কাঠের ওয়ারড্রোবের কাছে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ছেন লেডী কে-কে। আজ্‌কের দিনে কোন্‌টা যে ঠিক ম্যাচ্ কর্‌বে এ যেন তিনি ঠিক কর্‌তে পার্‌ছেন না। মব্-চেন্, না ডিমো-চেন, না বুর্জোয়া-চেন, হাওয়াই, হনলুলু না কামসকাট্‌কার কটকী শাড়ী, বল দুল, চাঁদ দুল না বিস্ময়বোধক দুল, স্থির করে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না ; মাঝে মাঝে স্যার কে-কে'র অভিমত চাইছেন ; স্যার কে-কে নিজের আয়না নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এবং তাতে বারবার মিসেস এন সি বটব্যালের সোনালী স্বাক্ষরের প্রতিচ্ছবি পড়ায় লেডীর আহ্বানে সাড়া না দিয়েই বল্‌ছেন ইংরাজীতে, মার্ভেলাস (মানে চমৎকার)! লাভলি (মানে মনোরম)! পারফেক্ট (মানে এর পর আর কিছু হ'তে পারে না)!

লেডী কে-কে'র রেডিয়োয়-মেলানো লেডী-কব্জি ঘড়িটায় যখন পৌনে সাতটার একমিনিট কম তখন উভয় পক্ষে আক্রমণ আর পাল্টা-আক্রমণ সুরু হ'ল : 'হ'ল ?' 'হাঁ'—কিন্তু বলেই আবার এক খাব্‌লা পাউডার, নয় ক্রীম, নয় লিপ্‌ষ্টিক, নয় রুজ, কানের এ-পাশটা, গালের এখানটা, শাড়ীর

এই ব্রোচটা, গলার এই বো-টা, জামার এইখানে সাদা কণার নিয়ে লড়াই।

যে ঘড়িতে দম দিতে হয়না, আলোর স্পর্শে যার দম হয়, চলার গতিতে যে চলে, আর ম্যাসাচুসেট্‌সের গবর্ণরের হাতের ঘড়িটি ছাড়া যে ঘড়ির জুড়ি নেই স্যার কে-কে'র হাতে সেই ঘড়িতে পৌনে সাতটা পার হয়ে গেল। প্রসাধন-টেবিল সংলগ্ন বৈদ্যুতিক বোতামটা দিলেন টিপে স্যার কে-কে-রে, আয়নার দিকে শেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। সোফারের ঘরে আলো জ্বলে' খড়খড় শব্দ বাজল বেলটায়। সোফার তৈরী, গেটের প্রহরীর ঘরে আয়নার কাছে আর একবার উর্দিটা টেনে দেখে নিল।

নিউ-মডেলের নিষ্কলঙ্ক অদ্ভুত রকমের মিহি ধূসর রঙের মসৃণ অতি-সুস্থকায় জীবন্ত গাড়ীটা গাড়ীবারান্দায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, কলিকালের গরুড় আগমন-অপেক্ষায় স্থিরচিত্ত। সিঁড়িতে অবতরণের শব্দ পাওয়া যায়, খাস বিলেত থেকে আনানো দুর্লভ জুতোর পদক্ষেপ, নির্ধূ্ল চারখানি পা, স্যার কে-কে-রে, লেডী কে-কে-রের নির্ধূ্ল পদক্ষেপের অবতরণিকা। সমস্ত বাড়ী নিঝ্‌ঝুম হয়ে আছে ঐ অতি-সুস্থকায় জীবন্ত গাড়ীটার মতো—ল্যাপডগটা (কোলের কুকুরটা, কোলের ছেলেটা নয়, কেননা, এবাড়ীতে ছেলে নেই, বোধ হয় থাকা সমীচীন নয়) পর্যন্ত। ভেতরে দু'জনে মিলে কিনে আনা লেডীর পছন্দসই কার্পেটে কঠিন স্পর্শ পড়ল চারখানি বিলিতী জুতোর, অতবড় গাড়ীটা একটু যেন দুলল,

কিন্তু পরক্ষণেই আদুরে ছেলেমেয়ের মতো এদের আশ্রয় দিল নিউ-মডেল : স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়ে পাঁচ মণ আড়াই সের, আধাআধি ভাগ।

অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে এই বিপুল ন্য নরমাদি হোটেলের ভেতরে বাইরে। অনেক গাড়ী—ঠেলাগাড়ী নয়, রিক্সা নয়, পাল্কী বা ফিটন গাড়ী নয়, জীবসাঙ্গিক যুগ, ইংরাজীতে যাকে বলে প্যাস্টোরাল এজ মানুষ পার হ'য়ে এসেছে বহুদিন, আদম নয়, এটম বোমার যুগ, ফোর্ডের সেই চার চাকার রথ নয়, নিউমডেলের যুগ, একটা নয়, সাতটা নয়, অসংখ্য, এই মোড় থেকে ঐ মোড় পর্যন্ত। অতবড় রাস্তার ওপারে জনতার ভীড়; এখানে জনতার প্রবেশ নেই, তবু জনতা দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে দেখে, ওরই মধ্যে জ্ঞানী লোক অঙ্গুলিনির্দেশে অভ্যাগতদের পরিচয় জানায় জনতার কাছে ; এপার-ওপারের মাঝে পুলিশ। জনতাকে বিশ্বাস নেই, বিশিষ্ট ব্যক্তি, পদস্থ-ব্যক্তি (অফিসার নয়, অফিসিয়াল), মেয়র, শেরিফ, মন্ত্রীমণ্ডলী আস্‌বেন। আস্‌বেন স্যার কে-কে……

আমি জানতুম, আপনি আসবেন, ইংরেজীতে কলকল ক'রে বল্‌লেন মিসেস এন্ সি বটব্যাল।

না হলে আপনি কি ছাড়তেন? খানিকটা নুয়ে পড়ে বল্লেন স্যার কে-কে।

চোখে কেমন যেন একটা শিবের নাচন নাচিয়ে টানা ভ্রুর অনেক নীচে এক জোড়া লাল ঠোঁটের ফাঁকে উচ্চারিত হল, এমন রাগ করতুম……

কোরাসে হেসে উঠলেন তিনজনই ; স্যার কে-কে, লেডী কে-কে আর মিসেস্ এন-সি বটব্যাল। অনর্গল হাস্‌তে পারেন এঁরা, লিভারে কোন দোষ নেই, অতি সুস্থ যকৃৎ আর অতি অনর্গল হাসি। দাঁত বের করে হাস্‌ছেন মিসেস এন সি বটব্যাল, সব কটা এক মাপের দাঁত, জনতার-মধ্যে এ দাঁত খুঁজে পাওয়া যায় না। দাঁতে এমনি অসাধারণত্ব নিয়ে জন্মেছেন মিসেস বটব্যাল। আপনি কি ম্যাকলিন দিয়ে দাঁত মাজেন ? (ডু ইউ ম্যাক্‌লিন ইয়োর টীথ ?) হ্যাঁ (ইয়েস্)। বৈজ্ঞাপনিকের এই কল্পনা জাগিয়েছেন মিসেস বটব্যাল। অসাধারণ সুদীর্ঘ বত্রিশ পাটি দাঁত ; তারই গোটাকয়েক কখনও ঢাকা পড়েনা, এত হাসেন অনর্গল মিসেস বটব্যাল ; পাৎলা ঠোঁটে রক্ত-রাগ ম্যাকলিন দন্তরাজিকে আরও শুভ্রোজ্জ্বল করে তোলে। গোবিন্দের মা নয়, চোপসান নয়, স্নেহ-মসৃণ ফর্সা গণ্ডদেশে তাঁবু ফেলেছে কোন্ কোম্পানীর রক্তিমা ; রক্তাল্পতায় ব্লাড-ব্যাঙ্কে হানা দিতে হয়েছিল মিসেস্ বটব্যাল এমন কাহিনী কখখনো বলেন নি কিন্তু ভারত সরকারের আমদানী নীতির ফলে কস্‌মেটিকস্ কি রকম দুর্লভ হ'য়ে পড়েছে এবং কত কষ্টে কালোবাজার থেকে পাওয়া গেছে তা অবশ্য দু'একজনকে বলেছেন। ঠোঁটে আর গালে বিভিন্ন কোম্পানীর উপনিবেশ স্থাপনার ফলে ধরা যায়না সুন্দরী মিসেস্ বটব্যালের ঠোঁট আর গালের আসল রঙ, যেমন বোঝা যায়না, টানা ভ্রুর প্রাকৃতিক বিস্তার কতটা ছিল ; জাপানী মেয়ে নাপিতের ধারালো ক্ষুরের পরিক্রমায় তার

কোন চিহ্নও নেই, শিল্পীর তুলিতে তার সবটাই চাপা পড়েছে —চারুকলার নিখুঁত নৈপুণ্য। চুল, হ্যাঁ চুল আছে, অজস্র চুলের গোছা, বব নয়, ভারতীয় চুলের জাঙ্গাল আশ্চর্য শৃঙ্খলায় আবদ্ধ এবং আরও আশ্চর্য, বাঁধা খোঁপায় একটা চিরুণী— মিসেস্ বটব্যালের পাছাপেড়ে শাড়ী-পরা দিদিমার খোঁপায় খোঁপা-চিরুণীর মতো চ্যাপ্টা!

ঘোম্‌টা বার বারই হস্‌কে পড়ে যাচ্ছে—এবং বারবারই স্নায়ুদৌর্বল্যজয়ী নিষ্কম্প হাতে তুলে দিচ্ছেন মাথায় এই কপালের সীমান্ত পর্যন্ত। আনুষ্ঠানিকভাবে চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন এখনও বাকী, প্রীতির সম্মেলন স্বুরু হয়েছে—ল্য নর্মাদির লম্বা বারান্দায়, এখানে-ওখানে ছোট ছোট গুচ্ছ, প্রীতির আলাপ, কলা-বিশেষজ্ঞেরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইছেন আর হো হো করে হাস্‌ছেন। হাতে ওদের যেন কিসের পাত্র, ছোট ছোট কাচের, পাৎলা ঠুন্‌কো কাচের, টলটল করছে একটু রঙিন তরল—বিয়ার, হুইস্‌কি, সেরি, স্যাম্পেন, ভার্মুথ, না, লেমন স্কোয়াস? বুদ্ধদেব হলে বল্‌তে পারতেন। 'আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন?' 'পেয়েছিলাম—খুলিনি।' 'সে কি?' 'হ্যাঁ, যদি চিত্ত চাঞ্চল্য জাগে, জরুরী কাজ ছিল কিনা।' বুক কাঁপিয়ে হো হো করে হাসি, অনর্গল। কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে সাদা উর্দিপরা পরিবেষকেরা, ওরা হাসে না, হাস্‌তে নেই, ওরা কথা কয় না, কইতে নেই, ওরা তাকিয়ে থাকে যেমন তাকিয়ে থাকে দেয়ালগুলো, যে দেয়ালের কান নেই। জলে-নাড়া

শ্যাওলা দামের মতো মাঝে মাঝে এই গুচ্ছগুলো সরে এদিক-ওদিক যায়। জলের কলকলানি কিন্তু অবিরাম।

সূক্ষ্ম মস্‌লিন পরেছেন মিসেস এন সি বটব্যাল, সহরের নিরুপমা সুন্দরী দীর্ঘদন্তী মিসেস বটব্যাল, ততোধিক সূক্ষ্মতর একটি ব্লাউজ, সরু রূপোর বুনট নাকি?—অগ্রহায়ণের শীতে নিষ্কম্প মিসেস বটব্যাল—হস্‌কে-যাওয়া ঘোমটাটা আল্‌তো করে টেনে দিচ্ছেন কপালের সীমান্ত পর্যন্ত—আপনিই যা গড়িয়ে কাঁধ পর্যন্ত নামে। দীর্ঘ ম্যাকলিনের দাঁতগুলো বের করে হাসছেন মিসেস বটব্যাল, এত বড় দাঁতেও কি বত্রিশটার দরকার হয়? 'ভারী খুসী হয়েছি আপনি আসাতে, নইলে এম্‌নি রাগ করতুম' সুমুখের চারটে দাঁতই কি যথেষ্ট নয় এ কয়টি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে?

সবুজ, না ঠিক সবুজ নয়, নীল, না ঠিক নীলও নয়, নীলে-সবুজে নীল্‌সবুজ শাড়ী উড়িয়ে অভ্যাগতগণের এক গুচ্ছ থেকে আর এক গুচ্ছে মুহূর্তের জন্য প্রজাপতির মতো ডানা দুটো নেড়ে আপ্যায়ন জানাচ্ছেন মিসেস বটব্যাল। এবার বস্‌বার সময় হ'ল। আবহাওয়াটা গরম হয়ে গেছে, ধোঁয়ার মতো উঠছে উত্তাপ, ভীষণ গরম আবহাওয়া, চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধনের উপযুক্ত হাওয়া, হারী আপ, ক্লোজ আপ, বসে পড়, বসে পড়। জায়গা ঠিক আছে, সব আর-এস-ভি-পি'র দল, অনুষ্ঠাতারা তালিকার নক্সা নিয়ে ছুটোছুটি করছেন, মিঃ এস সিং, এইখানে এই টেবিলের মাথায়, মিসেস এস সিং ঐ টেবিলে মিঃ ডি-কে ব্যানার্জির পাশে, মিসেস্‌

ব্যানার্জি এই যে মিঃ ভোসের পাশে। কোথায় লেডী কে-কে, এই যে এই শ্যামলদাস বাজোরিয়ার পাশে, কোথায় স্যার কে-কে, এই যে, নগরীর খ্যাতনামা সুন্দরী নীল্‌সবুজ শাড়ীর আড়ালে স্বপ্রতিষ্ঠ মিসেস এন-সি বটব্যালের পাশে, আর তারই আর এক পাশে চারুকলা শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধক মহানগরীর কোতোয়ালশ্রেষ্ঠ রায়বাহাদুর ডি-এন মোদক। এই সারিতে বসেছেন সেচসচিব, মৎস্যসচিব, রাজস্বসচিব, মেয়র, সেরিফ এবং তাঁদের শ্রীমতীগণ পরস্পরের বান্ধবীর মতো। ল্য নর্মাদির মতো প্রথম শ্রেণীর ফরাসী নামিক হোটেলীয় ভোজ-রীতিতে দীক্ষা নেবার জন্যও এসেছেন কোন মিষ্টারের মিসেস নতুবা মিস্। জাতে ওঠার সোপান ল্য নর্মাদির দোতলা পর্যন্ত কার্পেট পাতা। খালি গায়ে উঠোনে কুশাসন পেতে কলাপাতায় রক্তমাংসের হাতে একগাদা সেদ্ধ-ভাত চট্‌কে মেখে গোগ্রাসে খাওয়া নয় বা মাটির গেলাসে পানীয় পান নয়; দেশের স্বাধীনতা এসেছে মাত্র চৌদ্দ মাস আগে, গ্রামকে সহরে পরিণত করার দামোদরীয় পরিকল্পনা আরও পনের বছর পরের কথা, আজ ল্য নর্মাদি জীবন্ত, চারুকলা প্রদর্শনীর একমাত্র যাদুঘর। কাঁটা-চামচ, গোল চামচ, লম্বা চামচ, চ্যাপ্টা প্লেট, গর্ত প্লেট, চ্যাপ্টা প্লেটে টুপির মতো সাজানো সাদা গামছা, যার একটা মর্যাদাকর ইংরেজী নাম আছে। মূক পরিবেষকেরা বরফ জল ঢালে গ্লাসে, অনুষ্ঠানের সভানেত্রী তড়িৎগতিতে টেবিলে রঙিন কাঠের হাতুড়ি মেরে মাইকের কাছে দাঁড়ান, ইংরাজী

উচ্চারণের গুটিকয়েক শব্দ হলটায় ঝরে পড়ার আওয়াজ প্রতিধ্বনি তোলে ঃ এবার জাতীয়-সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ হবে। চারুকলা-বিশেষজ্ঞের ভীড় একনিষ্ঠ ভক্তিতে উঠে দাঁড়ায়, সবে মাখন-লাগান রুটির টুকরোটা চিবোতে চিবোতে থেমে যান রায়সাহেব পি-সি ভট্ ; সবে পরিবেষণ-করা সাদা ঘন ঝোলের পাত্র থেকে গোল হাতায় খানিকটা যা ঢেলে দিয়েছিলেন গলায় তা সন্তর্পণে গিল্‌তে থাকেন মিস সাকসেরিয়া, শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে ঠোঁটের আঠা মুছে নেন ক্যাপ্টেন সেইন।

সবাই বসতে পেয়ে ভীষণ প্রতিহিংসায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল ঐ ঝোলের পাত্রে ; নগরের কোতোয়ালশ্রেষ্ঠ হাতের কাঁটা নিয়ে মাইকের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। চারুকলা সম্বন্ধে সারগর্ভ রস পরিবেষণ করলেন রায়বাহাদুর ডি-এন মোদক। বল্‌লেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে……

দেশ স্বাধীন হবার চৌদ্দ মাস পরেও ভোলাবাবুদের একথা মনে করিয়ে দিতে হয়, সুতরাং একথা চৌদ্দ মাস পরেও মৌলিক এবং যারা কিছুতেই উপলব্ধি করতে চায়না দেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের সুপ্ত চেতনাকে নাড়া দেয়ার জন্যও এ অপরিহার্য। হ্যাঁ, সত্যিই দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাইতো সেকথা সর্বাগ্রে বললেন কোতোয়ালশ্রেষ্ঠ, বললেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং সেজন্য তাঁদের দায়িত্বও বেড়েছে এবং আজ আর ইংরেজের আমলের মতো তাঁদের উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বেড়ালে চলবে না, বিদেশী আমলে যা শোভন ছিল তা

স্বাধীন আমলে শোভন নয় এবং স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়·····

মৌলিক প্রাথমিক পাঠ। ইংরেজের আমলে উচ্ছৃঙ্খলতাই ছিল যাদের ধর্ম এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়েই যারা স্বাধীনতা এনেছে তাদের আজ সে অস্ত্র সম্বরণ করতে হবে; কেননা উচ্ছৃলতার জোরে তারা একটা বিপরীত জিনিস এনেছে যার নাম স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়।

কাঁটা চামচ প্লেট গ্লাস ঝোল বজায় রেখে টেবিলে টেবিলে কি সতর্ক থাবড়ানি। এক সঙ্গে এতোগুলো থাবড়ানি আত্মস্থ করে বলতে লাগলেন কোতোয়ালশ্রেষ্ঠ চারুকলার তত্ত্বকথা, বললেন, শৃঙ্খলা একটা কলা, সেইটে আরও অনুগত বিনত হলে হয় সুশৃঙ্খলা, মানে চারুকলা। আপনারা জানেন, ইংরেজের আমল থেকে খাঁটি ইংরেজের হাতে আমি এই চারুকলা আয়ত্ত করেছি, নাগরিকদের এই চারুকলাই আমি শেখাবার চেষ্টা করেছি, আজও সে দায় আমার ওপর পড়েছে এবং আমি জানি চারুকলার এই একটি মাত্র শিক্ষাই আছে, তা হচ্ছে সুশৃঙ্খলা, জাতি যদি তা প্রদর্শন করতে পারে তবেই এই চারুকলার অনুষ্ঠান সার্থক······

মাছ ভাজা, কাঁটা দিয়ে কাঁটাছাড়া মাছভাজা তুলে নিচ্ছেন লেডী কে-কে, টেবিলে টেবিলে সতর্ক প্রশংসার থাবড়ানি।······

সভানেত্রী অকস্মাৎ রঙিন কাঠের হাতুড়িটা মেরে ইংরিজিতে তাঁর অভিভাষণ পড়তে লাগলেন; তাতে একথা

স্পষ্ট করেই বলা থাকল যে, জনগণের খাদ্যবস্ত্র সংস্থানের জন্য যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায় এবং বাস্তুহারার পুনর্বসতিকে জাতীয় সমস্যা বলে গণ্য করা হয় এবং এদের জন্য পৃথক পৃথক সচিব থাকতে পারেন তবে জাতীয় মনের খোরাক চারুকলা সংস্থান ও তার আবাস ব্যবস্থার জন্যও একজন ভারপ্রাপ্ত সচিব থাকা উচিত……

কাঁটাটা মাংসপিণ্ডে গেঁথে রেখেই পোলাও মুখে টেবিল থাবড়ে উঠলেন মিঃ বি-এন আঢ্যি ; চারদিকে প্রতিধ্বনির রেশ সম্পূর্ণ না থামতেই সভানেত্রী মিসেস বটব্যাল বল্‌লেন, আসুন আমরা সেই অনাগত কলা-সচিবেরই স্বাস্থ্য পান করি। সঙ্গে সঙ্গে সবাই গ্লাস নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরলেন, শ্যামলদাস বাজোরিয়ার পাশে লেডী কে-কে'র গ্লাস ইতিমধ্যে নির্জলা হ'য়ে গেছল, রীতিরক্ষায় শূন্য গেলাসটা মুখে ঢাললেন।

সভানেত্রী কলহাস্যে বললেন, অনাগতের স্বাস্থ্য পান করে আমরা আগতদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে চাই না, অতএব, আসুন আমরা পর পর সচিববৃন্দের স্বাস্থ্য পান করি। লেডী কে-কে তিনবার তাঁর শূন্য গেলাসটা গলায় ঢাল্‌লেন।

আইসক্রীম চাটার সময় কেউ একজন জনগণমন গাইতে লাগ্‌লেন। উঠতে হ'ল যখন কারুরই উঠতে ইচ্ছে নেই ; লোকটা এক ষ্ট্যাঞ্জা ছেড়ে দু'ষ্ট্যাঞ্জা তার এক লাইন দু'বার করে গাইছে। শরীর যেন সোফা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু প্রদর্শনী বাকী আছে।

রাত সাড়ে ন'টা, সবাই প্রদর্শনী কক্ষে ভীড় জমালেন।

শিল্পীদের কলা-নৈপুণ্য স্তব্ধ, নির্বাক। তেল, জল, নানারকমের দৃশ্য, এঁরা যা ভালবাসেন। শিল্পীর প্রেরণা এঁরা, এঁরাই কিনতে পারেন মোটা টাকায় শিল্পীর শ্রম-সার্থকতা। ছবি কি এঁরা দেখছেন? দেখতেও পারেন; এঁরা সহস্র-চক্ষু, এঁরা জানেন নখদর্পণ বিদ্যা, ঠিক কে কোথায় আছেন, বল্‌তে পারেন, মুচকি হাসেন, ঘাড় কাৎ করেন, হাত তুলে হাত ঝেঁকে অভিবাদন জানান, আবার বহুদূরে কোন জীবন্ত ছবির দিকে প্যাট্‌প্যাট্‌ করে তাকিয়ে থাকেন। কোন নূতন প্যাটার্ণ চোখ এড়িয়ে যায় না শ্রীমতীদের, কোন নূতন কাট দেখতে ভোলেন না শ্রীমানেরা, কারুকে আপ্যায়নে ভুল হয় না। আলাপে আপ্যায়নে দর্শনে প্রায় সবটাই ঘোরা হ'য়ে যায়, না ঘুরলেও ক্ষতি নেই। 'ভীড় ভাল লাগেনা আমার' বলেন লেডী কে-কে; 'আমারও' বলেন বাজোরিয়া। 'ছবিখানা দেখেছেন?' 'চাই আপনার?' 'বড্ড দাম করেছে যে'। বাজোরিয়া দাঁড়ান না, ছুটে যান মিসেস বটব্যালের কাছে, মিসেস বটব্যাল তেম্‌নি তড়িৎ-গতিতে একখানা টেবিলে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, হালদারের ম্যাডোনা (নব পর্যায়) ১১০০৲ টাকা, কিন্‌লেন স্যার লেডী কে-কে। টেবিল নেই, করতালির ঝড়।

১৩৫৫, মাঘ

তিলোত্তমাসম্ভবম্

আফগান পাহাড়ের মাথায় নিরাকার হিম-নীহারিকা থেকে অবতীর্ণা সৌন্দর্যের তিলোত্তমা ক'লকাতার ভীড়ে হারিয়ে গেছে। শ্রীলক্ষ্মীর আবিষ্কারে অক্টোপাসের হাত ছাড়িয়ে নিখিল বিশ্ব মন্থন সুরু করেছে কলম্বসের সন্তানেরা। লাটসাহেবের পাঁচ গজ দূর থেকে, হাজার লোকের সারাজঙ্গল তাড়িয়ে আনা বাঘ-শিকারের মতো অবশেষে বায়ুমণ্ডলবিদারী ম্যাসাচুসেটস ভবনের নীচের তলায় শীততাপ নিয়মিত দুই শত বর্গ-ফুটের প্রখ্যাত নাচঘরে মায়াজাল পড়ল সুন্দরীশ্রেষ্ঠা স্বর্ণমৃগীর বন্ধন-প্রত্যাশায়।

নির্বোধ লোকসমাজের বহু উর্ধস্তরীভূত হর্ম্যলোক কাল-বৈশাখীর দুরন্ত বাত্যায় আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছে।

দেবী-আবাহনে স্বতোৎসারিত নানা উপাচার নৈবেদ্যের চূড়ার মতো হয়েছে পর্বতপ্রমাণ। চীনা-সংস্কৃতিকে লজ্জা দিয়ে যুগল পদারবিন্দ বন্দনায় পাটা কোম্পানী দিয়েছে জলশীত-তাপ-নিরোধী সু, সক্সো লিমিটেড এনেছে উজ্জ্বল চীনাংশুকের রামধনু মোজা, কামস্‌কাট্‌কা রেয়োঁ দিয়েছে কচিকলাপাতা রঙের নগ্নিকা শাড়ী, স্যার গ্যালাহাডের পৃষ্ঠপোষিত কুটির।শল্প-প্রসূতির পয়োধরাপ্রদর্শনী বক্ষাবরণ ; এসেছে সর্বঋতুজয়ী গারষ্টিনের প্রসাধনী কস্তুরী সাবান, ইউনিভার্সাল কসমেটিক্সের ওষ্ঠাধর-রঞ্জনী, ডাইহার্ড এণ্ড ডাইহার্ডের দুর্জেয় গিরিশৃঙ্গ থেকে বিমানে সমাহৃতা সুবাসী স্নো, রোজ এণ্ড রুজ ব্রাদার্সের কপোল-লাঞ্ছনার লালিমা, আর সিনথেটিক ড্রাগ হাউসের

কৃষ্ণকুন্তলদামে রসসঞ্চারী হেয়ার লোসন। গোলকুণ্ডা, গোলকোণ্ঠ আর সমুদ্রগর্ভ থেকে অপ্রাকৃতিক আঘাতে উদ্‌গীর্ণ সহস্র প্যাটার্ণের হীরাসোনা-মণিমুক্তার আভরণ; কানে গলায়, কব্জিতে, তাগায় তা দুলবে, জড়াবে, ঝল্‌সাবে আর বাঁধ্‌বে।

ইণ্ডো-আমেরিকান্ এজেন্সীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্যার ভি ভেল্লোডি চারদিকে অভূতপূর্ব সমর্থনের অভিনন্দনপত্রগুলি পড়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন এবং আত্মতৃপ্তিতে মোটা চশমাটা টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। খাস মার্কিণ সাহেবের মুসলমান ওস্তাদ দিয়ে কাটানো পাস্তালুনের পকেট থেকে নরম ঘিয়ে রঙের চার ভাঁজ করা রুমাল আল্‌তো ভাবে ঘাড়ে গলায় মুখে ঘুরিয়ে নিতেই মনে পড়ে গেল। আজ এক মাস এই আয়োজন চলছে। এক মাস ধরে সব ক'টা রোজকার খবরের কাগজে তিনি আফগান পাহাড়ের নিরাকার হিম-নীহারিকা থেকে অবতীর্ণা সৌন্দর্যের তিলোত্তমা সন্ধানের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন, এক মাস ধরে সচিত্র পাটা কোম্পানীর উপানৎ, সস্কো লিমিটেডের উজ্জ্বল চীনাংশুকের রামধনু মোজা, কামস্‌কাটকা রেয়োঁর কচি কলাপাতা রঙের নগ্নিকা শাড়ী, স্যার গ্যালাহাডের পয়োধরা-প্রদর্শনী বক্ষাবরণ, সর্বঋতুজয়ী গার্ষ্টিনের কস্তুরী সাবান, ইউনিভার্সাল কসমেটিক্সের ওঠাধর-রঞ্জনী, ডাইহার্ড এণ্ড ডাইহার্ডের দুর্জেয় গিরিশৃঙ্গ থেকে সমাহৃতা স্নো, রোজ এণ্ড রুজ ব্রাদার্সের কপোল-লাঞ্ছনার লালিমা, সিনথেটিক ড্রাগ

হাউসের কৃষ্ণকুন্তলদামে রসসঞ্চারী হেয়ার লোসন দুই-তিন কলামে সাজিয়ে বিজ্ঞাপিত করেছেন সারা দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে, অবশেষে কাজু বাদাম ও আলু ভাজার ডিস্ এগিয়ে দিয়ে সাংবাদিকগণকে আপ্যায়িত করেছেন। তিলোত্তমা সন্ধানের ঢাক ঢোল তাঁরই টেবিলে লাগানো বিজলী বোতামের চাপে বেজে উঠেছে। সারা ক'লকাতার উর্ধস্তরীভূত হর্ম্যলোকে হাই ব্লাডপ্রেসারের হৃৎস্পন্দন জাগালেন ইণ্ডো-আমেরিকান্ এজেন্সীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্যার ভি ভেল্লোডি।

আজ সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবে রাত্রি ১১টায় বায়ুমণ্ডল-বিদারী ম্যাসাচুসেট্স ভবনের নীচের তলায় দুই শত বর্গ-ফুটের প্রখ্যাত নাচঘরে—যখন সকল উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশাকে রূপ দিয়ে ধরা দেবে ক'লকাতার ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা।

চার ভাঁজ করা নরম ঘিয়ে রঙের রুমাল মুখে গলায় ঘাড়ে আল্‌তো ভাবে বার পাঁচেক রগড়িয়ে আন্‌তেই অকস্মাৎ আবার যেন মনে পড়ে গেল। টেবিলের বাঁ পাশে লাগানো বিজলী-বোতাম টিপ্‌তেই চার সেকেণ্ডের মধ্যে এসে দাঁড়াল উর্দিপরা বেয়ারার শ্রীবশম্বদ দাস। স্যার ভেল্লোডি সাম্‌নে থেকে পার্কার, ওয়াটারম্যান, শেফহার্ডের কলম তিনটি একে একে তুলে নিতে নিতে আবেগহীন কণ্ঠে বল্‌লেন, সোফার। বলেই উঠ্‌লেন। মানিব্যাগ ঠিক আছে কিনা দেখ্‌লেন। পত্রগুলি আর একবার চোখ বুলোলেন। তার

পর না দেখে বেয়ারারের দিকে একটা ফাইল এগিয়ে দিলেন। বেরিয়ে গেলেন।

সোফার গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটু দূরে রাস্তার ওধারে স্থির ক'রে রাখ্‌ল, তার পর একটি বিড়ি বের ক'রে ঘুমের আমেজ আনার ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে দিল। ফস্‌ করে মুখের কাছে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, তার পর একরাশ ধোঁয়া, তার পর ধোঁয়া-কুণ্ডলী।

স্যার ভেল্লোডি লিফ্‌টে উঠে এলেন। ৭ নং ফ্ল্যাটে—কম্‌সেকম ৩৬টি ফ্ল্যাট আছে যে পাকা-বাড়ীর, তার ৭ নং ফ্ল্যাটে। দরজার পাশে ঠিক জায়গাটিতে হাত পড়তে ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল; একখানি মুখ বিস্ময়ে-আতঙ্কে বলে উঠল, ওঃ আপনি!

স্যার ভেল্লোডি জবাব দিলেন না। দরজা আরও খানিকটা খুলে গেল। ঢুক্‌লেন। প্রথম ছোট্ট ঘরটা পেরিয়ে দ্বিতীয় প্রশস্ততর ঘরটায় ঢুক্‌লেন। ইজিচেয়ারটা পাশে রেখে বড় সোফায় বসলেন, সোজা হ'য়ে বসলেন, গা এলিয়ে দিলেন না। অনুগতা সেই মুখখানির দিকে না তাকিয়ে বললেন, ব'সো। তার পর মিনিট খানেক আর কিছু বল্‌লেন না।

সিগারেট শেষ হয়েছে, প্লাষ্টিকের একেবারে নূতন ডিজাইনের আধার বের করলেন, সস্নেহে বাঁ হাতে একটি তুলে নিলেন, নির্লিপ্ত ভাবে মুখের সিগারেট জল-দেয়া ভস্মাধারে চেপে ধরলেন, ততোধিক নির্লিপ্ত ভাবে বাঁ হাতের সিগারেট

ওষ্ঠাধরে রাখলেন, মুখের কাছে আগুন জ্বল্‌ল, তার পর এক রাশ ধোঁয়া, তার পর ধোঁয়া-কুণ্ডলী।

শ্রীলতা!

বলুন।

ভস্মাধারে সিগারেট টোকা মেরে ভেল্লোডি বল্‌লেন, তুমি আমার আবিষ্কার, এ কথা মানো?

শ্রীলতা মাথা নীচু ক'রে বলল, শত লোকের ভদ্রবস্তির কথা মনে করলে আজও শিউরে উঠি।

আমারই কথার প্রতিধ্বনি। শ্রীকান্তকে মনে পড়ে?

আপনি মনে না করিয়ে দিলে মনে পড়ে না।

তোমার বিয়ে-করা স্বামী শ্রীকান্ত। কোথায় আছে জানো?

আপনি না বললে কোন ঔৎসুক্য নেই।

তোমার ছেলেটি থাক্‌লে আজ কত বছরের হ'ত?... বলতে পারবে না তো তুমি? ও এক দুঃস্বপ্ন মাত্র। কেটে গেছে।...ভগবানের ইচ্ছে তুমি বিশ্ববন্দিতা হবে, তাই তো তুমি আমার আবিষ্কার। শ্রীলতা!

বলুন।

আজকের দিনটা জান?

বলেছিলেন, আজ আমার মহা পরীক্ষা।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি। আজ তোমার মাথায় পড়বে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমার মুকুট! এক মাস ধরে আয়োজন করেছি। এর মানে জানো?

আজ্ঞে না।

নদীর স্রোত দেখেছো কখনো? গ্রামের মেয়ে—দেখেছো বৈ কি। ও হ'চ্ছে জলের স্রোত, জলকণা মাত্র। ও যদি টাকার স্রোত হ'ত?

আমি ভাব্‌তে পারি নে।

সকল ভাবনা আমার। এক মাস ভেবেছি। এক মাস কাজ করেছি। তিলোত্তমার যাচাইয়ে নিয়োগ করেছি সাত জন বিচারক। আমি—আমি তাদের রাজী করিয়েছি। এক মাস ধরে মন্থন চলেছে। শ্রীলক্ষ্মী উঠ্‌বেন। শ্রীলক্ষ্মীর হাতের কব্জিতে থাক্‌বে পয়েলা নম্বরের ইঙ্গিত। শ্রীলতা হবে সেই শ্রীলক্ষ্মী।

আমি?

তুমি, শ্রীলতা, আমার আবিষ্কার! বিচারকেরা তা জানে। হাতের কব্জিতে থাক্‌বে ইঙ্গিত, এক নম্বর। বনেদী ঘরের, ভদ্র ঘরের, অভদ্র ঘরের, হাসপাতালের, সেলুনের, ক্লিনিকের, হ্যাঁ, আরও পাঁচ জায়গার সুন্দরীরা থাক্‌বে পর-পর নম্বর দেয়া। বিচারকেরা বিচার করবেন। ভাল কথা, তোমার নাচ-শেখা শেষ হয়েছে?

আপনি তো দেখলেন না এক দিনও?

শ্রীলতা, আমি যে-ওস্তাদদের কাজে লাগাই, তাদের কাজ দেখতে হয় না। আর, জলতরঙ্গের সঙ্গে তোমার কণ্ঠ-সাধনা?

শোনাবো?

চলি! প্রস্তুত হ'য়ে থেকো। হ্যাঁ, মতিবাঈকে তুমি দেখেছো কখনো?

অদ্ভুত সুন্দরী!

পঞ্চমা, পঞ্চমা সে। যে প্রথমা সে আমার আবিষ্কার।

স্যার ভেল্লোডির গাড়ী এই পথ বরাবর ছুটে গেল।•

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে লোক দাঁড়িয়ে গেছে ম্যাসাচুসেট্স ভবনের নীচের তলায় মায়াজালের আশে-পাশে। গাড়ী-চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম; ক্রসবেল্টের ট্রাফিক পুলিশ ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। তবু ভীড় বাড়ে। সংবাদপত্র কত লোক পড়ে? কত লোক পড়ে জেনেছে আজ তিলোত্তমার আবিষ্কার হবে রাত্রি ১১টায়, হয়তো সে মায়াজালে পড়বে এই পথেই—এই সদর দরজার পথে? কত লোকে শুনে জেনেছে স্বর্ণমৃগীর সম্ভাব্য আগমনবার্তা? কত লোক ভীড় দেখে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রমন্থনে শ্রীলক্ষ্মীর অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করবে বলে?

চোখ ঝল্‌সে-যাওয়া আলো ঠিক্‌রে পড়্‌ছে ম্যাসাচুসেট্স ভবনের কাচের প্রাচীর থেকে—সূর্যের আলো, পশ্চিমে হেলে-পড়া শেষ কটাক্ষ-রশ্মি। আলো সোজা পথে চলে; সোজা পথে মস্ত মাঠ পার হ'য়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সোজা ঠিক্‌রে পড়েছে ম্যাসাচুসেটস ভবনের শার্শিতে। ক্রশবেল্ট-আঁটা বুক-চেতানো ট্রাফিক পুলিশের ব্যস্ত বিচরণের চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সদর কবাট খোলা, প্রবেশ নিষেধ লেখা নেই; তবু

বাইরে থেকে সন্ত্রস্ত উঁকি মারার সাহস নেই তাদের যাদের নাম জনসাধারণ। অন্য কোন নাম নেই এদের, আর কোন পরিচয় নেই এদের। ফুটপাথে যারা সংসার পেতে বসেছে এরা তাদের কেউ নয়, ঝাঁকা মাথায় যারা বাজারে বাবুর পেছনে ঘোরে এরা তাদের কেউ নয় বা পাটের ফেঁসোয় যারা কলের মজুরী করে এরা তাদেরও কেউ নয়; এরা রসিক, সচেতন, সতৃষ্ণ কৌতূহলী জনসাধারণ; কাগজ পড়ে নয় তো শোনে, রকে বসে নয় তো সওদাগরী অফিসের চেয়ারে, মাঠে দূর থেকে খেলা দেখে নয় তো ট্রামে টিকিট না কেটে চেঁচিয়ে খেলার সমালোচনা করে, রেশনের দোকানে কিউয়ে দাঁড়িয়ে উজীর-নাজির মারে, নয় তো সিনেমায় অবেলায় কিউ দিয়ে দাঁড়ায়, বৌকে আদর করতে গিয়ে মারে; নয় তো বিড়ি ফুঁক্তে-ফুঁক্তে পাশের বাড়ীর সবে-শাড়ী-পরা মেয়ের দিকে সলোল দৃষ্টিবাণ ছাড়ে, আর ক্রশবেল্ট আঁটা বুক-চেতানো ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে খেজুরে আলাপ করে, নয় তো গুঁতো খেয়ে খুসীতে সারা শরীর দুলিয়ে ছুটে পালায়, আবার ফিরে আসে। এরা জানে, ম্যাসাচুসেট্স ভবনে চওড়া শার্শির কবাট যত দরাজ করেই খোলা থাকুক অথবা ধাতুর অক্ষরে অক্ষয় ইংরাজী স্বাগতম্ লেখাই থাকুক—ওখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ওতে ঢুক্তে নির্দিষ্ট রকমের চেহারা চাই, নির্দিষ্ট পরিমাণের বড়োয়ানার স্বর্ণদণ্ড চাই, চাই নির্দিষ্ট ষ্টাইল। ক্রশবেল্ট-আঁটা বুক-চেতানো ট্রাফিক পুলিশের আশে-পাশে এ কথা জনসাধারণ জানে।

জানে, যারা মোটর করে আস্‌বে তাদের পথ ছেড়ে দেবে ট্রাফিক পুলিশ আর ড্রাইভারকে বল্‌বে রাস্তার ওধারে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখতে।

জনসাধারণ থেকে অকস্মাৎ উর্ধস্তরীভূত মিসেস্ মৃধা মুখার্জি আয়নার স্বচ্ছ পরিবেশ ছেড়ে কিছুতেই নড়তে পারছেন না। স্বামী নিশীথ রাতের অন্ধ-তমসায় তিন দিন একই কথা উচ্চারণ করেছেন : মৃ, রাস্তায় অগণিত লোকের সাক্ষাৎ মেলে, সাক্ষাৎ মেলে না তোমার, তোমার সৌন্দর্যের। অপরূপা তুমি। অকস্মাৎ উর্ধস্তরীভূত মিসেস্ মুখার্জি সলজ্জ খুসীতে স্বামীর কথা রাত্রির দৌর্বল্য মনে ক'রে মনের কোণেই সঞ্চিত রাখতেন। বাড়ীর ঝি গঙ্গার মা কিন্তু বাড়িয়ে তুল্‌ল ভয়ানক। এমনটি আর হয় না গো মা, এত বাড়ী কাজ কন্নু, ও মা, তুমি যেন মা সগ্‌গ থেকে উব্বশী নেমে এয়োছো! সাহঙ্কার খুসীতে মিসেস্ মুখার্জি একেও দাসীর তোষামোদ গণ্য করে 'তাকে' তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধালো তিলোত্তমা-আবিষ্কারে আত্মনিযুক্ত মিঃ মুখার্জির সামাজিক অনুষ্ঠানে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল বান্ধবেরা ; তারা বেশীর ভাগ মৃধা মুখার্জির দিকে তাকিয়ে ক্ষণিক মিঃ মুখার্জির দিকে তাকিয়ে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলেছেন যে, ডানাকাটা পরী সত্যিই যে মর্তে নাম্‌তে পারে মিঃ মুখার্জির সৌভাগ্য না দেখলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। লাকী চ্যাপ!

সগ্‌গের পরী মৃধা মুখার্জি আয়না থেকে মুখ সরাতে পারেন না। আজ তিলোত্তমার আবিষ্কার হবে তাঁর মধ্যে

স্বামীর সামান্য অসম্মতিতে তাই ঠিক হয়েছে, বান্ধবদের উগ্র আগ্রহ। কিন্তু তাদের আগ্রহকেও উত্তীর্ণ করে গেছেন আজ অকস্মাৎ উর্ধস্তরীভূত মৃধা মুখার্জি স্বয়ং। আয়না থেকে মুখ সরাতে পারেন না তিনি; এত সুন্দর, এত সুন্দর তিনি, বিশ্বের সৌন্দর্যকণা তিল-তিল জড় করেই কি হয়েছেন মৃধা? প্রসাধনের গন্ধমাদন আজ তাঁর টেবিলে, এই থেকে বিশল্যকরণী আহৃত তো হবেই, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আসবে থিয়েট্রিকাল্‌সের অঙ্গ-সজ্জাকর নূর মহম্মদ। শেষ পাকা প্রসাধনের স্পর্শ দেবে সে, তার পর···তার পর···

কেশসজ্জা-বিশেষজ্ঞা মিসেস্ মরগ্যানথিউর কারবার আজ বন্ধ; রুদ্ধ ঘরের আড়ালে আজ জগৎ তোলপাড়। তার মেয়ে মিস্ মেরী হবে তিলোত্তমা—ম্যাসাচুসেট্‌স ভবনের নীচতলায় নাচঘরের মায়াজালে। পাঁচ বছর আগে মেরীর দেহে একবার বসন্তের ছোঁয়া লেগেছিল, তার আবির ধুয়ে-মুছে গেছে, মুখমণ্ডলে রয়েছে নাতিগভীর শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন; তার পর মনোহুঃখে মিঃ মার্কিণ ইয়াঙের সঙ্গে কিছু দিন রেঁদেভ্যুতে মেতে ছিল মনের কোকিলকে উপেক্ষা করতে পারেনি ব'লে; কিন্তু স্বদেশের ডাকে ইয়াঙ যখন বিদেশের দয়িতাকে ফেলে গেল, তখন কেশসজ্জা-বিশেষজ্ঞা মা মিসেস্ মরগ্যানথিউ দিলেন আশ্রয়। বসন্তের ক্ষতচিহ্ন পুডিংয়ের পূর্ণতা দিয়ে মুখশ্রীর পরিবর্তন যাই হোক্, কেশসজ্জা নিয়ে একের পর এক পরীক্ষা চল্‌ছে অবিরাম—চাই সেই কেশসজ্জা যা একমাত্র ত্রিভুবনমনলোভা তিলোত্তমাকেই মানায়। আজ

কারবার বন্ধ, আজ অন্তরালে তোলপাড়।

তোলপাড় আজ নির্বোধ লোকসমাজের বহু উর্ধস্তরীভূত হর্ম্যলোক। সৌন্দর্য-সচেতন কেম্‌ব্রিজ-পাশ মেয়ে মায়া মঙ্গলম্, পাশের বাড়ীর অনিবার্য দৃষ্টিকে সজোরে জানালা বন্ধ করে বার বার অপমান করেন যে মায়া মঙ্গলম্, সৌন্দর্যের জোরে সনাতনীর ঘরে পড়ে হাতাবেড়ি-খুন্তীসার সেই মায়া মঙ্গলম্ রান্নাঘরের তোলা-জলে নিজের চেহারার প্রতিবিম্বে অশ্রু বিসর্জন করছেন। স্বামী তাঁকে না হতে দেবেন তিলোত্তমা, না দেবেন দেখতে কে হবে তিলোত্তমা। মেমেরা পর্যন্ত তাঁর আন্‌ইউজুয়াল বিউটীর তারিফ করেছে, বলেছে মোঙ্গলয়েড কার্ভ না থাক্‌লে······সেই মায়া মঙ্গলম্ অশ্রু বিসর্জন করছেন রান্নাঘরে তোলা-জলের প্রতিবিম্বে। আজ তোলা-জল সমুদ্র হবে।

সমুদ্র গণ্ডুষে পান করবে আজ জহ্নু মুনিরা ম্যাসাচুসেট্‌স ভবনের নীচতলায় দুই শত বর্গফুটের নাচঘরে। তিলোত্তমা আবাহন হবে ইতালীয়ান্‌দের জাজ বাজনা আর বলনৃত্যের ঐক্যতানে। ঠিক হয়ে গেছে কর্মসূচী। নির্দিষ্ট কালো বো কণ্ঠে সেঁটে সাদা সাদা-নয় হাঐয়ান সার্ট আর কালো পান্তালুন পরে যাত্রাগানের ছোক্‌রাদের ঘাঘরা-পরা নাচ নয়, কলেজী-মেয়েদের বন-মহোৎসব নৃত্য নয়, এ নৃত্য···কিন্তু সে আরম্ভ হবে আটটায়, সাড়ে আটটায়, চল্‌বে দশটা, সাড়ে দশটা। হবে খানাপিনা, ছাপা মেনু টেবিলে বেঁটে দেয়া থাক্‌বে আগেই কাঁটা-চামচ-প্লেটের পাশে। রাত আটটা

থেকে সুরু। গণ্ডুষে সমুদ্র পান করবে জহ্নু মুনিরা।

জনসাধারণের কৌতূহলের অবধি নেই। সাংবাদিকেরা এলেন। সাড়ে সাতটা থেকে আস্‌তে লাগলেন। সাড়ে দশটায় তিলোত্তমার আবিষ্কার। কিন্তু এলেন ওঁরা আগেই সাড়ে সাতটায়। কিছু না ফস্‌কে যায়। ওঁরা এলেন যাঁর যাঁর কোম্পানীর গাড়ীতে, যে গাড়ীগুলো একেবারে ভেঙে না পড়ে টিকে আছে, নয় তো সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মিলিটারী জীপে, মোটরে চড়ার মর্যাদা যতটুকু আয়ত্ত করা যায় কোম্পানীর ড্রাইভারের সৌজন্যে। কর্তব্যের খাতিরে ওঁদের আসা, যাঁর যেমন সাধ্যায়ত্ত পোষাক; একটু উঁচু চেয়ারের যাঁরা তাঁরা হরলালকার সেলে-কেনা স্যুটে, নীচু চেয়ারের যাঁরা তারা সপ্তাহে-একদিন-পাল্টানো ধুতিপাঞ্জাবীতে একটু আগেভাগেই এলেন আর গাড়ীবারান্দা থেকে করিডর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে যাঁদের এখানে অবাধগতিতে আসা সম্ভব তাঁদেরকে শ্লেষহিংসার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এঁদের অনেককে এঁরা বারে বারে এই ধরণের অনুষ্ঠানে দেখেছেন, নানা ভূমিকায় দেখেছেন, নানা রূপে দেখেছেন, মুখস্থ হ'য়ে গেছে এঁদের চেহারাগুলো, কণ্ঠস্থ হ'য়ে গেছে এঁদের কথাগুলো, নয়ন-যুগলে গেঁথে গেছে এঁদের আচরণগুলো—এরা আকাশচারী প্রজাপতি আর মধুপের দল।

আস্‌তে লাগলেন প্রজাপতি আর মধুপের দল যাঁর যাঁর মোটরে উড়ে—আস্‌তে লাগলেন তাঁরা যাঁরা বাড়ীর ছোট

সীমানায় আর কিছুতেই নিজেদের আগ্রহাতিশয্যকে বন্দী রাখতে পারছিলেন না, আয়নার কাছে ছুটোছুটি ক'রে যাঁরা ক্লান্ত বোধ করছিলেন, অথবা যাঁরা সামাজিক স্ত্রী বা বা স্বামীকে এড়িয়ে অপর কোন পরমাত্মীয় বা পরমাত্মীয়ার সঙ্গলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছিলেন।

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে যাঁরা বাড়ীতে স্বামী বা অন্য কোন সাথীর গৃহ প্রত্যাবর্তন বা গৃহাগমনের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরাও স্বামীর বা সাথীর গাড়ীতে আস্‌তে লাগলেন। জীবনে এমন অনুষ্ঠান কি নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে যেতে দেয়া যায়, দেয়া যায় জীবনকে এমন ক'রে ব্যর্থ হ'তে দিতে, যাদের জীবনে 'ওমর খৈয়াম' একমাত্র সত্য দর্শন?

'ওমর খৈয়াম' যাঁদের ব্যবহারিক জীবনে সত্য, অথচ সত্য যাঁদের নিঃসহায় অন্তরাল জীবনে মনুসংহিতা, তাঁরাও এলেন কাঁটায়-কাঁটায় আটটায়, নেমেই যাঁরা ঘড়ি দেখেন, সেকেণ্ডের সরু ঘূর্ণ্যমান কাঁটাওয়ালা ঘড়ি, নেমেই যাঁরা সমুখ দিয়ে চেয়ে ঘুপ্‌ ক'রে মোটরের দরজা বন্ধ করেন, মোটর ছেড়েই যাঁরা গম্ভীর পদচারণায় অগ্রসর হন, কিন্তু জনতাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে যাঁরা খুসী হন, অথচ জনতার কাছে যেতে ঘেন্না করেন, জনতার দৃষ্টি তাঁদের ওপর পড়ুক এ যাঁরা চান কিন্তু জনতার দিকে তাকাতে যাঁরা হীনতা বোধ করেন। তাঁরা এলেন আটটায় কাঁটায়-কাঁটায়।

কাঁটায়-কাঁটায় আটটায় খোলা হল ম্যাসাচুসেট্‌স ভবনের

নীচের তলায় শীততাপনিয়মিত তুই শত বর্গ-ফুটের প্রখ্যাত নাচঘর। দরজার প্রান্তসীমা থেকে ইতালীয়ান বাজনদার আর নাচনদারদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রান্তসীমা পর্যন্ত অসংখ্য টেবিলে মাথা উঁচু ক'রে আছে জলহীন কাচের গেলাসে ডোবানো ভাঁজ-করা ঝোলের অধোগতি থেকে জামা-কাপড়-বাঁচানোর সাদা হাতমোছা। গন্ধহীন পুষ্পগুচ্ছের আধার, ছোট-বড় চীনামাটির থালার পাশে চক্‌চকে ছুরি, কাঁটা, চামচ।

খাঁজকাটা গোলকধাঁধায় জল ঢেলে দিলে জলস্রোত যেমন সব কোণে ঠিক-ঠিক পৌঁছে যায় এই নানা ভাবাবেগাকুলে স্ফীতচিত্ত জনতাও সব টেবিলের পাশে বসানো লাল গদী-আঁটা চেয়ারে-চেয়ারে বসে গেল। এঁদের টেবিল-চেয়ার ছিল সংরক্ষিত সম্পত্তি; ব্যক্তিগত অধিকার সম্বন্ধে এঁদের চেতনা অতিপ্রখর, এঁরা জীবনের ঘাটে-ঘাটে সংরক্ষিত অধিকার কায়েম করেছেন, এঁরা সম্পত্তি কত পবিত্র তা জানেন, আর জানেন স্ত্রী কারও সম্পত্তি নয়; কোন এক যুগে স্ত্রী গো-সম্পদের মর্যাদা পেত এ শুনে এঁরা হাসেন, পরস্ত্রীর সঙ্গে এঁরা রসিকতা করতে জানেন চমৎকার। তাই এঁরা ঔদার্যের প্রতিযোগিতায় স্ত্রীকে ছেড়ে দেন বন্ধুর পাশে, স্বামীকে ছেড়ে দেন বান্ধবীর পাশে। একই টেবিলে কাঁটা-চামচে মাংস তুলে গালে ফেলতে লাগে বেশ, তেমনি আরাম হাসতে, সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে হাসতে; হেলে ঢলে সুগন্ধি ছড়িয়ে হাসতে, ডিনারের লম্বা খানায় চাট্‌নির মতো কাতুকুতুর রসিকতায় হাস্‌তে।

আরাম—আরও আরাম নাচ্‌তে। এ আট টাকা মাইনের, লোকের কাছে চেয়ে-নেয়া বিড়ি-খেকো যাত্রাগানের ছোক্‌রাদের ঘাগ্‌রা নাচ নয়, এ কলেজের শিক্ষিতা মেয়েদের শাড়ী-আঁটা মরুবিজয়ের কেতন ওড়ানো বন-মহোৎসব নৃত্য নয়, এ বল-নৃত্য। ৪৫ ডিগ্রীতে একের বাঁ হাতের পাণি অপরের ডান হাতের পাণিতে সস্নেহে স্থাপন ক'রে, একে অপরের কোমরে-কাঁধে হাত রেখে এক দুই তিন চার পদক্ষেপ; কিন্তু তা নয়, লম্বা হোক, বেঁটে হোক, এর ওর হৃৎস্পন্দন টেলিফোনে যেন কথা কয় এমন ক'রে চেপে ধরতে হবে বুকের রিসিভার—একে অপরের, যেন শোনা যায় লাপডাপের বাণী, কাছে আরও কাছে,—প্রদেশে প্রদেশে বিভক্ত সারা দেহের ভারতবর্ষ, দুই ভারতবর্ষের দুই মধ্যপ্রদেশে থাকবে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সংযুক্ত তাল, এক দুই তিন চার, দ্রুত লয়ে, ঠায়ে। বিদেশী ওস্তাদের কাছে মোটা মাইনে দিয়ে শেখানো-নৃত্য।

এল এক দীর্ঘায়তা। পদনখ তার দেখা যায় না। গাঢ় কালো একরাশ ঘাগরার কাপড় উঠেছে বহু দূর বেয়ে, হাঁটু, নাভি ছাড়িয়ে আরও কিছু দূর, তার পর নেই, একেবারে নেই। গাঢ় তমসার অস্তিত্ব যেখানে সীমানা টেনেছে সেখানে, ঠিক সেখানে দীর্ঘায়তা মা হ'লে যেখানে নবজাত ক্ষীরনালীর সন্ধানে অতি ছোট দু'টি ঠোঁট রাখত। ঠিক এইখানে আবরণ শেষ, আভরণ শেষ, লজ্জা শেষ, মুখেও তার চিহ্নমাত্র নেই। দীর্ঘায়তা কঠিনদেহ লোহার ঘোরানো চেয়ারে

স্থাপন ক'রে, জাজ বাজনাদারদের দেয়া সাদা সিগারেট লাল নখের চাপে ধরে লাল রঙের ঠোঁটে রাখে, ফস্ ক'রে আগুন জ্বলে, তার পর একরাশ ধোঁয়া, তার পরই ধোঁয়াকুণ্ডলী। দীর্ঘায়তা ধোঁয়াকুণ্ডলীর মাঝে বসে থাকে বিশ্রামকালে যখন অভ্যাগতেরা গোগ্রাসে মাংস চিবোয় নয় তো গণ্ডুষে সমুদ্র পান করে, কণ্ঠাবধি উন্মুক্ত নগ্নতা নিয়ে মাইকের কাছে বিলাতী শান্তিনিকেতনী ঢংয়ে গান ধরে আদরিণীর ভঙ্গিতে নুয়ে পড়ে, কানে-কানে স্বল্পভাষ ইসারার মতো। সুড়সুড়ি জাগে চার পায়ে, সুড়সুড়ি লাগে চার হাতে, সুড়সুড়ি লাগে ছুই হৃৎপিণ্ডদেশে, কান্নার গতিবেগ জাগে সর্বাঙ্গে। তার পর টেবিল ছেড়ে উঠে আসেন মিঃ কারমাকার মিস্ মাথাইকে নিয়ে, মিঃ ম্যাকফার্সান মিসেস্ লুবেককে নিয়ে, শ্রীভারতন্ শ্রীমতী যূথিকাকে নিয়ে······সব হলটায় মাইক্রোফোনের বাক্স-স্পীকার বসানো আছে, হাতে-পায়ে-হৃদয়ের সুড়সুড়ি হলের কোণায় কোণায় পৌঁছে যায়; নূতন নূতন অর্ডারে বয়স্ক-বৃদ্ধ বয়েরা ছুটোছুটি করে, খালি প্লেট ভরে যায়, খালি গ্লাসে টলটল ক'রে ওঠে অসাধারণ জল, ফস্ ক'রে জ্বলে আগুন, তার পর ধোঁয়া, তারও পরে ধোঁয়াকুণ্ডলী; শীততাপ-নিয়মিত নাচঘরের উত্তাপ এখন কত? এই ধোঁয়ার কুয়াসা কি কাট্‌বে? বিখ্যাত সাতচল্লিশ বৎসরের লেডী রস্ নাচছেন, পিটার্সন কোম্পানীর তরুণ ম্যানেজারের সঙ্গে নাচছেন, সারা হলটার মেঝে ঘষে' নাচছেন, মৃদু ভাষে কথা কইছেন অপ্রাসঙ্গিক,

কথা কইতে হয়। আকণ্ঠ-উন্মুক্ত নগ্নতা নিয়ে গান গাইছে দীর্ঘায়তা কঠিনদেহ নৃত্য-গীতিকার। এই নৃত্যের ছন্দে এক-দুই এক-দুই পায়ে কখন বেরিয়ে আসবে কলকাতার ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা?

তিলোত্তমা আছে এই ভীড়ের মাঝেই; তবু তাকে আবিষ্কার করা দায়; সম্ভাব্য তিলোত্তমাদের গায়ে ক্রমিক নম্বর সাঁটা আছে, তবু তিলোত্তমার আবিষ্কার কঠিন; অনেকেই খানাপিনায় এসেছেন, বসেছেন, কাসছেন, হাসছেন, নাচছেনও, তবু এঁদের অনেকেই নম্বর-সাঁটা তিলোত্তমা দলে নেই কেন, তা বলা কঠিন, যেমন বলা কঠিন এরাই কেবল নম্বর-সাঁটা তিলোত্তমা-গোষ্ঠী হ'ল কেন? ঐ মৃধা মুখার্জি বার বার মাথার চুল ঝেঁকে মুখখানাকে এগিয়ে ধরছেন, বাড়ীর ঝি গঙ্গার মা'র কথা কানে বাজে, যেন সগ্‌গো থেকে উব্বশী নেমে এয়েছো মা! শ্রীলতা কোথায়, শ্রীলতা!

নাচছে, সমস্ত হলটা নাচছে। বয়স্ক বেয়ারা-গোষ্ঠী আর সাংবাদিক-গোষ্ঠী গোত্রহারার মতো ওদের খানাপিনা আর নাচ হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে। বয়স্ক বেয়ারা-গোষ্ঠীর কাছে এ নাচ, এ খানাপিনা নূতন নয়, তবু নিত্য-অভিনব; ওদের জীবনে বিবিকে পরের হাতে বিলিয়ে নাচতে নেই, তাই অভিনব। খানা ও পিনার স্বাদ ওরা জানে, জানে না অমন অনর্গল অফুরন্ত মানি-ব্যাগ খালি ক'রে অর্ডার দিতে।

সাংবাদিকেরা আমন্ত্রিত প্রয়োজনে। এ প্রচারের যুগে সংবাদবাহী ওঁদের চাই। কিন্তু শোবার ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে নরম লেজের টিকটিকির মতো ওঁরা নির্জীব সাক্ষী। ওঁরা গণ্য প্রয়োজনে, নইলে নগণ্য, জাত-মাননীয় নয়, তাই অমান্য। এঁরা কোম্পানীর গাড়ীর মর্যাদা নিয়ে আসেন, আসেন কোম্পানীর সামাজিকতার দাবী নিয়ে, কিন্তু এঁদের স্তর নীচে, বহু নীচে। এঁরা খানাপিনার স্বাদ যদি পায় তো ঐ বয়স্ক বয়-গোষ্ঠীর মতো সে উচ্ছিষ্টের স্বাদ, বয়-গোষ্ঠীর মতোই ভাবতে পারেন না তাঁদের বাংলা বিবি পরের সঙ্গে শরীর লাগিয়ে নাচবেন বা লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁরাই আসবেন নাচতে আর কোথাও থেকে এক-একটি মেয়েকে কুড়িয়ে নিয়ে। ওঁরা স্ত্রীর আদরের মিন্‌সে, ওঁদের স্ত্রীর হাতে মুড়ো ঝাঁটার ভয়, আরও ভয় সমাজকে। তবু ব্যতিক্রম আছে এঁদের ভেতরে যাঁরা বেতনভুক্ হ'য়েও স্বাধীনতার ভাণ করেন, যাঁদের বিয়ার খেয়ে নেশা হয়, বারো আনার নেকটাইকে যাঁরা আড়াই টাকার মার্কিণী নেক্‌টাই বলে চালান আর বরিশালীয়া ইংরিজী বুলির মাঝে যাঁরা পাইপ টানেন। ফরমায়েসী লেখায় বিক্রীত-বিকৃত মসীজীবী।

তাঁরাও তাকিয়ে দেখছেন। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীতে হাতখানি হাতে রেখে নাচছেন মিসেস্ প্লিথোরা মিঃ ব্রিজেসের সঙ্গে, নাচছেন শ্রীলোহারাম ঢন্‌ঢনিয়ার সঙ্গে মিস্ শান্তনু পায়ে-পায়ে।

গান থাম্‌ল। মেঝে থেকে সাপের মতো এরা সরে

পড়ল টেবিল-চেয়ারের অলিতে-গলিতে। অকস্মাৎ একরাশ আলোর ঝাপটা পড়ল সেই মেঝেয়, আবার তেম্‌নি অকস্মাৎ নিভে গেল।

নাচঘরের বেয়ারার-প্রধান ছুটে এল—স্থায়ী মঞ্চের তলাকার একখানা সাদা তক্তা টেনে বের করল, টেনে এই মেঝের মাঝখানে বসালো; তারও ওপর বসালো একটি বড় জলচৌকি। আবার আলোর ঝাপ্‌টা এল এইখানটায়, এই জলচৌকিতে, আবার নিভে গেল। আর একটি সুইচে ঘরের অন্য সব আলো জ্বল্‌ল। কালো বো কণ্ঠে ঘোষক এলেন, মাইক্রোফোনে বল্‌লেন, এবার বিচারকেরা বস্‌বেন, তার পর আস্‌বেন একে একে সুন্দরীরা···ঘোষকের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই নানা ধ্বনি ও হাততালির ঝড় বয়ে গেল।

সুন্দরীরা আস্‌বেন, তিন মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ড ক'রে দাঁড়াবেন, বিচারকেরা দেখবেন, আপনারাও দেখবেন অবশ্য, বিচারকেরা রায় দেবেন, আবার ওঁরা আস্‌বেন, আবার দেখবেন আপনারা, বিচারকেরা, বিচারকেরা রায় পাকা করবেন, তার পর সর্বশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমাকে সঙ্গে করে আস্‌বেন দ্বিতীয়া······

আবার হাততালি আর মেছুয়াবাজারের বিশেষ এক রকম মুখে আঙুলপোরা কর্ণবিদারী শিষ্, আবেগকম্পিত শরীরের উদ্ভট গোঁঙানি, ধোঁয়া, ধোঁয়া-কুণ্ডলী, কাচের আধারে পড়ে অগ্নিতরলিকায় বান্ধবীর বাণীময় প্রতিবিম্ব।

বিচারকেরা এলেন ; সমানাধিকারের যুগোত্তীর্ণ স্বপ্নরাজ্যের চার জন বিখ্যাত মহিলা, তিন জন প্রখ্যাত পুরুষ। নারীর চোখে নারী, পুরুষের চোখে নারী। ছেলের ভাবী বৌকে স্বামীর চোখে দেখায় বিশ্বাস হয় না গিন্নীর, নিজে দেখতে হয়, ভবিষ্যতে মনোবাদ তো ওর সঙ্গেই হবে, ছেলেরও বিশ্বাস হয় না মাকে, সে নিজে দেখে। এখানে বিচারকের আসনে মহিলা চার, পুরুষ তিন, পাকা বিচারক, কালের চিহ্ন যাঁদের চোখের আশে-পাশে গভীর, পঁয়তাল্লিশ সাতচল্লিশ বাহান্ন বছরের স্মৃতি এঁকেছে যেখানে অতল কালিমা। চোখে প্রাকৃতিক আলো গেছে ম্লান হয়ে, জ্বলে উঠেছে কৃত্রিম হাজার শক্তির দামিনী আলো। খাতা, পেন্সিল, আরও কি সব সরঞ্জাম তাঁদের সাম্‌নে।

ঘরে আর সব আলো নিভে গেল। মেঝেয়-রাখা সাদা রঙের তক্তায় বসানো জলচৌকিতে হাজার শক্তির আলো হ'ল কেন্দ্রীভূত—অন্ধকারে বসে থাকা উর্ধস্তরীভূত হর্ম্যলোকবাসীর অক্ষিপটে তীব্র আলোর তির্যক্ গতি। অগ্নিতরলিকার স্বাভাবিক গতিপ্রভাবে উত্তেজনার উত্তাপ গুঞ্জনের বাষ্প ছড়াচ্ছে। পূব দিক্‌কার বাম কক্ষের অন্ধকার অপসারণ করতে করতে এলেন প্রথমা সুন্দরী।

শ্রীলতা !

ওস্তাদ শিখিয়েছে পদক্ষেপ, নটীর মুদ্রায় তার জঙ্ঘার উৎক্ষেপ আর প্রক্ষেপ, আকাশে দোলায়মান শিথিল হাতে যেন আহ্বান। সক্সো লিমিটেডের উজ্জ্বল চীনাংশুকে

রামধনু মোজায় জড়ানো, পাটা কোম্পানীর জলশীত-তাপনিরোধী পদাধারে সযত্নে-রাখা নরম পায়ে উঠে আসে শ্রীলতা জলচৌকিতে—হাজার শক্তির আলো ঠিক্‌রে পড়েছে যেখানে। মেসোকেপালিক করোটিতে কালো উলের কাফ্রি চুলে নির্ঘাৎ পড়েছে সিন্‌থেটিক ড্রাগ হাউসের রসসুঞ্চারী হেয়ার লোসন। বেণীবাঁধা নয়, ছড়ানো, সুবিন্যস্ত ছড়ানো চুল। তিন আঙুল কপালের নীচে সূক্ষ্ম ভ্রূ কামানো না আঁকানো? পার্সীয়ান চোখা নাক নয়, দ্রাবিড়ী নয়, বোঁচা, কিন্তু নিগ্রোছাঁচের নয়, মোগলের ছাঁচ, মোটার ওপর চোখা। হরিণের কালো চোখ দেখা যায় না শ্রীলতার নয়নে, শ্রীলতা বিড়ালাক্ষি, কবে পর্তুগীজের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কে বল্‌বে? পটলের মতো ছড়ানো নয়, আধখানা টোবা পেঁয়াজের মতো গোল। গালে মাংস আছে, হাস্‌লে টোল পড়ে না একটুও, খাঁজ পড়ে না নাকের কাছে, চোয়াল একটু সাম্‌নে ঝোঁকা, দাঁতে দাঁত লাগে না সহজে, ওপরের পাটি থেকে নীচের পাটি একটু এগোনো, মাংস খেতে এদের দূরত্বের অভিমান টের পাওয়া যায় না, হাসলে পাওয়া যায়, হাস্‌লেই মনে হয়, আপনি কি ম্যাক্‌লিন দিয়ে দাঁত মাজেন? ঝুম্‌কো-দোলানো কানে বিকৃতি-বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। সামান্য বোঁচা নাকের চাপা প্রশ্বাসের রন্ধ্রজোড়ার নীচে দ্বিতীয় বন্ধনীর মতো মুখগহ্বরের কোলাপসিবল ওষ্ঠদ্বার পাৎলা; ভেতরের নরম ঝিল্লী ওল্টানো পৌনে এক সিকি ইঞ্চি, তারই ওপর

ইউনিভার্সাল কস্‌মেটিক্সের ওষ্ঠাধর-রঞ্জনীর ঘন প্রলেপ। ওপরেও তাই, নীচেও তাই। কিন্তু এর বিস্তৃতিই শ্রীলতার বৈশিষ্ট্য। আকর্ণবিস্তৃত শ্রীলতার খোলা হাসি, আকর্ণবিস্তৃত বদন-ব্যাদান, আকর্ণবিস্তৃত লালিমায় ছিন্নমস্তার রুধিরসৌন্দর্য, পর্যুদস্ত প্রাকৃতিক মুখমণ্ডলে ডাইহার্ড এণ্ড ডাইহার্ডের দুর্জেয় গিরিশৃঙ্গ থেকে বিমানে সমাহৃতা সুবাসী স্নো-লেপনীর সৌকর্য, মাংসালো নিটোল কপোলে রোজ এণ্ড রুজ ব্রাদার্সের লালিমা, বাড়ন্ত থুৎনীর সূক্ষ্মক্ষেত্র সামান্য দ্বিধা-বিভক্ত। অকস্মাৎ মরালের মতো গ্রীবায় লুকানো কণ্ঠমণি আদমের আপেল, হয়তো বা উৎকণ্ঠায়ই কিঞ্চিৎ বহির্মুখী, সরল রেখার স্কন্ধ বাহুসংযোগ অবধি, আফ্রিকানদের মতো দীর্ঘবাহু। কিন্তু দুই বাহুসংযোগ থেকে স্যার গ্যালাহাডের পয়োধরা-প্রদর্শনী বক্ষাবরণী আবৃত নাভিদেশ পর্যন্ত বক্ষভাগ ত্রিকোণাকৃতি নয়, ক্রমান্বয়ে সোজা দু'দিক চেপে এসে এতটুকু কোমরে শেষ হয়নি, বরং খানিকটা চৌকোণো, আফগান পাহাড়ের চূড়ার মতো পীনোন্নত নয়। নিতম্বদেশ তরাই উপত্যকার মতো উদার প্রশস্ত নয় তেমন। সর্বাঙ্গে কাম্‌স্কাট্‌কা রেঁায়ার কচি কলাপাতা রঙের নগ্নিকা শাড়ী বা নিও-মস্‌লিন। গোলকুণ্ডা গোল্ডকোষ্ট আর সমুদ্রগর্ভ থেকে রস্ এণ্ড রস্ ব্রাদার্সের অপ্রাকৃতিক উদ্যোগে উদ্‌গীর্ণ বিচিত্র প্যাটার্নের হীরা-সোনা-মণি-মুক্তার আভরণ কানে গলায় কব্জিতে তাগায় জ্বলছে ঝল্‌সাচ্ছে।

প্যাটাগোনিয়ানদের মতো দীর্ঘাকৃতি নয় শ্রীলতা,

বুস্‌ম্যানের মতো খর্বাকৃতি নয়, সে কাফির নয়, হটেনটট নয়, তাতার নয়, বাঙালী বা গুজরাটী ঘরের আর্য-দ্রাবিড়ীর অসংখ্য বর্ণসঙ্করের অসংখ্য মেয়ের এক জন। বিচারকেরা ঝুঁকে বেঁকে দেখলেন, লিখলেন, ঘাড় কাৎ করলেন। শ্রীলতা আবার অন্ধকারে অপসৃতা হ'ল। তার পর···তার পর···তার• পর এলেন দক্ষিণ-আফ্রিকার বারোলঙের মতো বব-ছাঁটা একরাশ দেশী চুল ঝাকৃতে ঝাকৃতে মিসেস্ মৃধা মুখার্জি।

সাধারণ মোঙ্গল-দ্রাবিড়ী বাঙালী ঘরের বুস্‌ম্যানের মতো বেঁটে, সংসারের কাজকর্ম ফেলে চানের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে ঘষা-মাজা রংয়ের বৌ। কানের ভেতর দিয়ে মর্মে যে কথা গেঁথে গেছে তা সুরঝঙ্কারে বাজে, তুমি গো মা সগ্‌গো থেকে নেমে এয়েছো, স্বর্গের পরী যে মর্ত্যে নেমে আসে, এ মিঃ মুখার্জির সৌভাগ্য না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না, মৃধা, রাস্তায় অনেক লোকের দেখা মেলে তোমার দেখা মেলে না, তোমার সৌন্দর্যের······

বুস্‌ম্যানের মতো বেঁটে মৃধা মুখার্জি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে শাড়ীর আড়ালে ব্লাউজটা ভরে ওঠে ঠিকই, কণ্ঠ থেকে আয়তন বড় ছোট, আরও ছোট কোমর থেকে জঙ্ঘা পর্যন্ত দেহের বিস্তৃতি, কিন্তু অনাবশ্যক মেদ-মাংসের বিপুল প্রাচুর্য, মিসেস্ মৃধা মুখার্জি, তিলে তিলে নয়, তালে তালে তালোত্তমা। ফিক্ করে হাস্‌লেন মৃধা মুখার্জি, হাস্‌তে হয়, অনর্থক হাসতে হয়, হাস্‌তে জান্‌তে হয়, দাঁত বের করে হাস্‌তে হয়। সুমুখের দু'টো দাঁতের খানিকটা এনামেল খেয়ে ফেলেছে

পোকায়, দেখেই চীৎকার করতে ইচ্ছে হয়, দাঁতের পুকা ভাল কোরব……, হাস্‌লে সে দু'টো দাঁতও প্রকাশ্য হ'য়ে যায়; তবু হাস্‌তে হয়, গায়ের তাল-তাল মাংস নাচিয়ে হাস্‌তে হয়। তিন মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ড উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল,' মৃধা মুখার্জি নড়তে চান না, দর্শক-সমাবেশের আয়নায় যেন নিজের মুখ দেখছেন, গঙ্গার মা'র প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে না চার দিকে? যেন সগ্‌গো থেকে নেমে এয়োছো মা!……

ইয়েস্‌ মিসেস মুখার্জি…

মৃধার চৈতন্য এল, হাত দু'টো যৌন আবেদনের শেষ মুদ্রায় আকাশে তুলেই ছেড়ে দিয়ে গঙ্গার মা'র সগ্‌গো থেকে নেমে আসা মৃধা মুখার্জি স্বল্পান্ধকারে অপসৃতা হ'লেন, কানের পর্দায় অস্ফুট মৃ মৃ ধ্বনি।

মৃধার পেছনে নানা রকম শিষের আওয়াজ স্তিমিত হ'তে না হ'তেই মিসেস্‌ মরগ্যানথিউর ফিরে-পাওয়া বসন্তাক্রান্ত মেয়ে মিস্‌ মেরী কোণের হাল্কা অন্ধকার সরিয়ে হাজার শক্তির আলোয় আবির্ভূত হতেই, জ্বরের ওপর জ্বর আসার মতো, ঝাউবনে অবিশ্রান্ত শন্‌শনে হাওয়ার মতো, মেছোবাজার থেকে উঠে এল শিষের আর অনাভিধানিক উল্লাসের আর্তনাদ। মিস্‌ মেরীর কানের ওপর থেকে, কপাল থেকে, পেছনের ঘাড় থেকে উঠেছে ঘন চুলের আফগান পাহাড়, সে পাহাড়ের শেষ নয় সূক্ষ্মাগ্র চূড়ায়, সে পাহাড়ের শেষ মালভূমিতে। মাথায় বসানো কালো ছোট চ্যাপ্টা

ড্রামের মতো ; তারই নীচে টুলটুলে দুই চোখ, চুলের টানে মুখশ্রী খানিকটা ছুঁচোলো দেখালেও ওর মুখমণ্ডলের গোলাকৃতি নিঃসংশয়ে আভাসিত ; গোলাকৃতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বহিরাবরণ, নাকের চূড়ো আর ফুটো দু'টোও গোলাকার, ঠোঁট জোড়া ছোট আর গোল, থুৎনীটা ওপরে চুলের টান না পড়লে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বলে স্বীকৃত হতে পারে। এই অর্ধচন্দ্র আবক্ষ পরিব্যাপ্ত কিন্তু বক্ষস্ফীতিতে মন্বন্তরের স্মৃতি জাগরূক। একেবারে দুধের মতো অথবা রাজহংসের পালকের মতো শ্বেতাভ বস্ত্রাচ্ছাদন। কিন্তু লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ মাথায় বসানো কালো চৌকো চুলের ড্রামটার ওপর, মিসেস্ মরগ্যানথিউর সর্বক্ষণের দৃষ্টিও যেখানে নিবদ্ধ, কেশবিন্যাসে কেশবিলাসিনীরা সর্বকালে যেখানে আবদ্ধ হবে।

ইয়েস মিস্ মেরী······

তার পরে এলেন······

আরও এলেন······

এলেন মতিবাঈ। ক্ষণকালের জন্য মেছোবাজারের শিষও যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। সামান্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে নির্লজ্জতার সমাবেশ যে মুখমণ্ডলে তার কপালের নীচে নীচে নাসা-সঙ্গমস্থল থেকে কানের প্রায় শীর্ষভাগ পর্যন্ত একটানা কেশঘন ভ্রূ। রক্তিম অচ্ছোদপটল, বোঝা যায় না নেত্র-গোলকে এই নেশা কিসের আর কি ঔৎসুক্যে কোটর এমন বিস্ফারিত। ধনুকের মতো একটু সামান্য বাঁকা নাক, পাৎলা দু'টি ঠোঁটের প্রান্তসীমায় এসে হঠাৎ যেন দূরে দাঁড়িয়ে গেছে। মতিবাঈ

অকারণে হেসে উঠলেন, আর রংমাখা গালে টোল পড়তে দেখেই মেছোবাজারের বিস্মৃত আর্তনাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠল। মতিবাঈ বৃত্তাকার প্রগণ্ড পর্যন্ত অংশফলক ঘুরিয়ে একটু পিছন-ফিরে দাঁড়ালেন। নিটোল উরঃফলকের পর শারীর-স্থানের নতি কটি অবধি ব্যাপ্ত, শিল্পীর শিল্পের দিক্‌চক্র-রেখাঙ্কনের মতো পরিব্যাপ্ত হয়েছে শ্রোণীভার, ঋজু সুষুম্নাকাণ্ড পর্শুকাদেশে ঈষৎ আনত যেন, ঘূর্ণ্যমান ধরিত্রীর ছন্দ তার উর্ধস্থিতে। মতিবাঈ। বিখ্যাত সৌখীন নর্তকী মতিবাঈ। তিন মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ড পর ধীরে অপসৃতা হলেন। হাজার শক্তির আলো ব্যর্থতায় সাদা কাঠের জলচৌকিতে পাণ্ডুর হ'য়ে রইল।

সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার আহ্বানে এর পর যিনি এসে দাঁড়ালেন তিনি সকলের মনে জাগালেন এক বিস্মিত জিজ্ঞাসা, তার পরই সমস্ত হলটা প্রকাশ্য সরব হাসিতে ফেটে পড়ল। খোঁপায় মনোহারী দোকানে কেনা ঝিনুকের সাঁওতালী ফুল সেঁটে এই মেয়েটি একটু আগে মাংস চিবোচ্ছিল। আধো অন্ধকার থেকে তিনিই প্রকাশিত হলেন হাজার শক্তির আলোয়। জলচৌকিতে বসানো ছেলের হাতের তৈরী তাল কাদার পুতুল অথবা ঝোলা ডালের বড়ি; যত ওপরের দিকে টেনে তোলা যায় তত থ্যাবড়া হ'য়ে ব'সে পড়ে। করোটিকা ঘুরে থুৎনী ঘুরে একই ব্যাসের নিখুঁত বৃত্ত, উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবীর মতো একটু চাপা, কাদার মতো রং, রকমারি ওয়াক্সে-স্নোতে চক্‌চকে। সরু কপালের নীচে একটু নাকের

মতো কিছু অনুমান করা যায়, ইচ্ছে হয় ঐ নাসারেখাকে শক্ত লোহার চিমটে দিয়ে তুলে রাখার। পাঁচের-খাদের মতো হাসি, তাতে লালিমা, আর ওরই ফাঁকে একটি শ্বদন্ত, ঐ একটি মাত্র শ্বেত-চিহ্ন সারা দেহে। সৌন্দর্য-সচেতন মিসেস্ সম্বরম্ হাসির হুল্লোড়কে স্তুতির প্রবলাবেগ মনে করে একবার নৃত্যভঙ্গিমায় খানিকটা ঘুরে এলেন। ঝলকে ঝলকে হাসি উঠতে লাগল, তিন মিনিট চৌত্রিশ সেকেণ্ডে মিসেস্ সম্বরম্ তাঁর তিলোত্তমার সঞ্চয় নিয়ে অপসৃতা হলেন, জলচৌকির সাদা আলো ঝক্‌মক্ করতে লাগল।

তার পরও এরা-ওরা ও অনেকে এল-গেল। তারও পর হলের সমস্ত আলো জ্বলে উঠল।

সাংবাদিকদের গলা শুকিয়ে কাঠ। সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটা, একবিন্দু জল পর্যন্ত নয়, শুধু তাকিয়ে দেখায় যাঁদের অধিকার সেই সাংবাদিকদের। সাংবাদিকরা দর্শক নয়, বিচারক নয়, ঘটনার পরিবাহক ওঁরা, হা করে দেখে ওঁদের গলা শুকিয়ে কাঠ।

ঘোষকের ঘোষণায় ঐ শুষ্ক কণ্ঠনালী খানিকটা সরস হ'য়ে এল। ঘোষক জানালেন, এবার সব সুন্দরী একবারে আস্‌বেন, আর একবার বিচারকেরা তাঁদের নির্ভুল রায় মিলিয়ে দেখবেন, আপনারাও দেখবেন, তার পর বিচারকদের রায় মেনে নিয়ে হাজির করা হবে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমাকে।

প্রত্যাশায় আবার মুখে আঙুল-পোরা শিষের ঘূর্ণিবায়ু হলটাকে যেন দুমড়ে দিল। ছায়াছবির মতো সুন্দরীরা

এলেন, এসে দাঁড়ালেন। রেশন দোকানের সারি দিয়ে দাঁড়ানো নয়, ক্যামেরার মুখোমুখি উরঃফলক যতটা সম্ভব স্ফীত ক'রে একটু হাসি, দাঁত বের-করা হাসিমুখে দাঁড়ানো। ফোটোগ্রাফারদের অতি তৎপরতা আর ক্যামেরার সবিদ্যুৎ ক্লিক-ক্লাক শব্দে খিল্‌খিলে হাসি পায়।

সম্ভবত শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য এল। ঘোষক জানালেন, এবার সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমাকে নিয়ে আস্‌বে দ্বিতীয়া। কলকাতার ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া তিলোত্তমাশ্রেষ্ঠার আবিষ্কার হয়েছে।

হলঘরে আবার চাঞ্চল্য জাগে। এবার রহস্য-মৎস্যের চক্ষু বিদীর্ণ করবেন অজ্ঞাতবাসী অর্জুন, আসবেন দ্রৌপদী বরমাল্য নিয়ে। রহস্য-মৎস্যের চক্ষু বিদীর্ণ হ'ল মুহূর্তেই, এলেন দ্রৌপদী নয়,

শ্রীলতা!

তার সঙ্গে এলেন দক্ষিণ-আফ্রিকার বারলণ্ডের মতো বব-ছাঁটা একরাশ দেশী চুল ঝাঁক্‌তে ঝাঁক্‌তে মিসেস্ মৃধা মুখার্জি, গঙ্গার মা'র সগ্‌গের পরী।

এবার আর শিষের, চীৎকারের শেষ নেই। শেষ হবে কিনা কেউ জানে না। ছবিতোলার শেষ নেই, শেষ হবে কিনা কেউ জানে না। চারদিককার নেভানো আলোয় ঊর্ধ-স্তরীভূত হর্ম্যালোকবাসী জনতার ওঠা-বসার শেষ নেই, শেষ হবে কিনা কে জানে?

অন্ধকার ভেদ ক'রে হাজার শক্তির আলোয় এগিয়ে

এলেন স্যার ভেল্লোডি। শ্রীলতার মাথায় পরিয়ে দিলেন তিলোত্তমার মুকুট, প্রগণ্ড থেকে শ্রোণিদেশব্যাপী ছুলিয়ে দিলেন তিলোত্তমা-পরিচয়। শ্রীলতার রোজ এণ্ড রুজ ব্রাদার্সের লালিমা-লাঞ্ছিত দুই কপোলে গভীর স্নেহবোধে ইণ্ডো-আমেরিকান্ এজেন্সীর ডাইরেক্টরের অধরস্পর্শ হ'ল। হলটায় ঠোঁটে-ঠোঁটে সুড়সুড়ি জাগল, সুড়সুড়ি জাগল লেরিংসে, তার পর সমস্বরে মেছোবাজারী ধ্বনি। ঘোষক এগিয়ে এসে তড়িৎগতিতে মিসেস মৃধা মুখার্জির গণ্ডদেশ দু'হাতে চেপে দু'টি চুম্বন-চিহ্ন আঁক্‌লেন। সমস্ত হল উন্মত্তের মতো উঠে পড়্‌ল, তার পর বন্ধু-বান্ধবী স্ত্রী-স্বামী বিক্ষিপ্ত হ'য়ে কেমন একাকার হ'য়ে গেল, জলচৌকির আলোয় জাগানো ধ্বনি সারা হলে জাগালো প্রতিধ্বনি। ফোটোগ্রাফারদের ভীড় ঠেলে সাংবাদিকেরা ছুটে গেলেন তিলোত্তমার দু'টি বাণী পেন্সিলে লিখবেন বলে। শ্রীলতা হেসে বল্‌ল, আমি বাংলা জানি না, ইংরাজীও জানি না, হিন্দী তো জানিই না।

সাংবাদিকেরা এই বাণীই লিখে নিলেন বিজলী উদ্দামতায়, আর সাফল্যের গৌরবে সার্কাস ক্লাউনের মতো ভীড় ঠেলে বেরোতে লাগলেন বাইরে।

স্যার ভেল্লোডি নিষ্কম্প দেহে, নিষ্কম্প পদভারে শ্রীলতার হাতখানি নিজের বাহুকক্ষে জড়িয়ে এগোতে লাগলেন দরজার দিকে। জনতার সহস্র চক্ষুর আলো ঠিক্‌রে পড়ছে অপস্রিয়মান যুগলের ওপর।

ওঁরা লিফ্‌টে উঠে এলেন ৭নং ফ্ল্যাটে—কম্‌সে-কম ৩৬টি

ফ্ল্যাট আছে যে পাকাবাড়ীর, তার ৭নং ফ্ল্যাটে।

প্রবেশের জন্য দরজা ফাঁক ক'রে ধরে স্যার ভেল্লোডি ডাক্লেন, তিলোত্তমা!

বলুন।

শ্রীকান্ত নাদারকে মনে পড়ে?

কে শ্রীকান্ত?

তোমার বিয়ে-করা স্বামী?

কিন্তু শ্রীলতা তো মরে গেছে।

স্যার ভেল্লোডি তিলোত্তমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে কানের কাছে কি গালের কাছে ঠিক বোঝা গেল না, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, শ্রীকান্ত বেঁচে আছে আমেরিকায়। কিন্তু বাঁচা-মরার ব্যবধান কতটুকু একবার দেখ তাকিয়ে······

শ্রীলতা আর্তনাদ ক'রে বল্‌ল, ও—কি!

রিভলভার! তুমি আমার আবিষ্কার এ কথা ভুলেও যেন ভুল না হয়। তিলোত্তমা একনিষ্ঠা সতী। ব'লে স্যার ভেল্লোডি আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। অকস্মাৎ ঘুরে অচঞ্চল পদক্ষেপে নীচে নেমে যাবার জন্য লিফ্‌টের খাদের কাছে গিয়ে ..জোরে বোতাম টিপলেন।

১৩৫৯, বৈশাখ

হারামজাদা

মাথাটা কাঁচা বেলের মতো কামিয়ে ফেলে শ্রীচেতন খাস্তগীর করোটির কেন্দ্রস্থলে দশ বারোটি বাংলা কেশ রেখে দিলেন। শ্রীচেতন খাস্তগীর, যিনি নিখিল এশিয়া অহিংস সম্মেলনের আধা-প্রেসিডেণ্ট, অখিল ভারত চট-বয়ন সমিতির সম্পাদক, সর্ববঙ্গ বেরিবেরি-বিরোধী সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক ও সুন্দরবনের স্বাবলম্বী আশ্রমের অবৈতনিক বাবা।

এই মাথা-কামানো নূতন নয়, সরকারী চাকরীর মোটা বেতন ছেড়ে তিনি যেদিন ঘোষণা করলেন, ছয় পয়সার বেশী তাঁর অধিকার নেই, সেদিন থেকেই মাথা-কামানোর সংস্কার তিনি মেনে আস্‌ছেন। সাদা পর্দায় ম্যাজিক লণ্ঠনের অন্ধকার আলোয় আর জ্ঞানদার লাঠির বাড়িতে ফুটে-ওঠা ভারতীয়দের গড়পড়্‌তা আয়ের পরিসংখ্যান্‌ তাঁর রক্তে একদিন টাট্টু ছুটিয়েছিল ; তাই একদিন কেমন ক'রে মগজে উঠ্‌ল এবং তারই বেগে কদম্‌ কদম্‌ বাড়িয়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ভীড় ঠেলে নিতান্ত সভাপতির অনুরোধে ঘোষণাটা তেঁতুল-বিছের মতো ছেড়ে দিলেন বিদ্যুদ্‌স্পৃষ্ট জনতার কানের পর্দায়। সেদিন থেকে, ঠিক সেদিন থেকে তিনি মাথাটা কাঁচা বেলের মতো কামিয়ে আস্‌ছেন। প্রথমদিন অভ্যাসবশত গদী-আঁটা চেয়ারে থেব্‌ড়ানো দেহে নূতন তোয়ালে জড়িয়ে দেড় গজ দেহোর্ধে ৫-পয়েণ্টে ছাড়া অস্‌লার পাখার নীচে বড় বড় দু'খানা আয়নার মাঝামাঝি সখারাম প্রামাণিকের আধা ক্ষয়ে-

যাওয়া সেফিল্ডের ক্ষুরের কাছে মাথাটা সমর্পণ করে দিয়েছিলেন, আধুলি আর বক্শিশে মিলিয়ে দশ আনা পয়সা সখারামের হাতে গুণে দিতে আর একবার কামানো মগজের ভেতর জ্ঞানদার পরিসংখ্যান্ টাট্টু ছুটিয়ে দিচ্ছিল কিন্তু কয়েটির কেন্দ্রস্থলে পিতৃকোষের অবদানস্বরূপ পাওয়া শক্ত চামড়ায় বাঁচানো এই এতটুকু ছোট মাংসের টিলা কেটে রক্তপাত হয়নি এই কৃতজ্ঞতায়ই বাকী পয়সার বেদনা ভুলে সখারামের কপালে-তোলা নমস্কারটা গ্রহণ করেছিলেন। কাঁচা বেলের মতো মাথা হাতিয়ে টিলার আশেপাশে গজানো তৎকালীন দশবারোটি কেশ নির্বিঘ্নে আছে অনুভবও করেছিলেন। পরিণামে এরাই একদিন রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়ে শ্রীমতী খাস্তগীরের এক ইঞ্চি জিভ্ বের করেছিল।

কাঁচা বেলের মতো মাথায় নিজের তৈরী নারিকেল-রসরাজ ঠাস্লেন স্বদেশী ভেষজ গবেষক, মোটা মাইনের প্রাক্তন সরকারী কৃষিবিদ্ শ্রীচেতন খাস্তগীর। আজ বন্শীলাল মুরারকা আসবেন।

ছয় পয়সার গভীর খাদে নেমে গিয়ে ত্যাগী খাস্তগীর বুঝতে পারলেন ছ'টা পয়সাই তাঁকে রোজগার করতে হবে এবং এই ছ'টা পয়সায়ই তাঁর রোজকার খাবার সংস্থান করতে হবে। সানুচর স্ত্রী সরমার 'ছাঁটাই করা চল্বেনা'র আইনানুগ আন্দোলনে ছয় পয়সার ক্ষুদ্র প্রাচীর পড়-পড় হয়েও খাস্তগীরের শিরচূড়ায় মাংসের টিলার কেশ কয়টির মতো টিঁকে গেল। প্রথম ছাঁটাই হ'ল দিনরাতের একটি

চাকর ও ঠিকে ঝি। সব চোটটা এসে পড়ল সরমার ওপর কিন্তু স্বাবলম্বী আশ্রমের বাবার প্রসাদে বাইরে থেকে আসা আশ্রমবাসী ছেলেদের দুর্নিবার সেবার ইচ্ছায় সবটাই সামলে নিলেন। আশ্রমের ছেলেরা সকাল-বিকেল দুহাতে দু'বালতি জল তুলে হাতের পেশী পুষ্ট আর পা-জোড়াকে ভারসাম্যে নিপুণ করে তুল্‌তে লাগল। ব্যায়ামবীরদের উপলব্ধি করতে দেরী হল না দুদিক্‌কার ঝোলানো বাল্‌তিতে যে মাথার রগ পর্যন্ত টান পড়ে তা সর্বদৈহিক সহজ ব্যায়াম পদ্ধতি ছাড়া কিছু নয়। উট্‌কো হয়ে কয়লা ভাঙতে হাতের ওঠা-নামায় আর মেরুদণ্ডকে সবটা বাঁকিয়ে নিয়ে খাস্তগীর-দম্পতির দড়ির মতো রগ বের-করা নির্ধূল চরণচতুষ্টয়ের স্পর্শ কপালে ঠেকানো যে অন্ত্র-সঞ্চালনের চমৎকার নিদান এ তারা একদিনেই বুঝে ফেল্‌ল। ভোরবেলায় তখন সাধক ও সাধ্বী খাস্তগীর মাটীর বারান্দায় বিছানো মাদুরে ব'সে চরকায় কাপড়ের সূতো বুন্‌তে গিয়ে সতরঞ্জির সূৎলী কাটেন। তাতে ছয় পয়সা আর ছয় পয়সা বারো পয়সা রোজগারেও জট্‌ পাকিলে যেতে লাগ্‌ল বটে কিন্তু মাথা-কামানো খাস্তগীর মাথা-পিছু ছ'পয়সার বরাদ্দ রাখার চেষ্টাও করেছেন আপ্রাণ। সেদ্ধভাতের রাক্ষুসে লোভকে কাঁচা তণ্ডুলে সংযত ক'রে পালং শাকের শেকড়ে-লাগা মাটীতেও ভাইটামিন আবিষ্কার করলেন, খোসার আবর্জনা এখানে জম্‌তে পায়না বলে ইঁদুর-বেড়াল-কুকুর-কাক আর ধাঙরের উপদ্রবও গেল কমে, অনভ্যাসের ভাইটামিন যদি অন্ত্রনালীতে দামোদরের

কল্লোল সৃষ্টি ক'রে জলের নিয়মে কোথাও গড়িয়ে পড়্তে চায় তো সেজন্য স্বাবলম্বী আশ্রমের গর্ত-খোঁড়া বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে। আদ্যিকালের মুনিঋষিদের উপবাসের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও ইতিমধ্যে আশ্রমবাসীদের সুবিদিত হয়ে গেছে। ব্রতচারী নৃত্যে কোদাল চালিয়ে যতরকমের ভাইটামিনের ক্ষেত তারাই করেছে, গ্রাম থেকে আনা ধান ঢেঁকির নীচে ফেলে কত ধানে কত চাল হয় এ বুনিয়াদী শিক্ষাও তাদের হয়েছে, ঘোড়া একবার শুয়ে পড়্লে আর যে সে কোন কাজেই লাগ্‌বেনা এ জ্ঞান টন্‌টনে বলে দুপুরের রোদে কষ্টসহিষ্ণুতার পরীক্ষায় বেরিয়ে পড়ে আশ্রমবাসী ব্রহ্মচৈতন্যেরা খাস্তগীরের 'রসরাজ' ওরফে স্বাবলম্বী আশ্রমের যাঁতায় থেঁৎলানো পচা নারকেলের উদ্ভট-গন্ধি নির্ভেজাল রস, ত্রিফলা-ঘষা বিদ্‌ঘুটে কালি ওরফে কাগজ ক্ষয়ে যাওয়া আরকের প্রচারে। অর্থাৎ জাতিসংগঠনমূলক কুটিরশিল্প তল্‌তলে কচি পালং শাকের মতো গজিয়ে ওঠে স্বাবলম্বী-আশ্রমে। চেতন খাস্তগীরের স্বাবলম্বী আশ্রম।

সেই চেতন খাস্তগীর। বন্‌শীলাল মুরারকা আস্‌বেন বলে মাথা কামিয়ে নিলেন। অনাবশ্যকবোধে নিম্পাড় ও হাঁটূর্ধ পরিমাণ সাজিমাটীতে কাচা কাপড় পরে বসে আছেন মাটীর দাওয়ায় একখানি নারকেলের ছোবরায় বোনা ৩″×২″ সতরঞ্চিতে, সম্মুখে ব্রহ্মচারীদের সহজাত ছুতোরের বুদ্ধিতে পেরেক-মারা না-বার্ণিশ জলচৌকি। তার ওপর কয়েকখানি হাতে-তৈরী চট্‌-কাগজ, একটি হংসমধ্যে বকোযথা ব্লু-ষ্টার

ভ্যাকুমেটিক সিনিয়ার পার্কার পেন কুইঙ্ক কালিতে ভর্তি। স্বাবলম্বী আশ্রমের অবৈতনিক বাবা চেতন খাস্তগীর।

বাইফোকাল ষ্টিলফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে চরকার সুতোয় কোমরে-বাঁধা ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানীর ঘড়ির দিকে তাকালেন; বড় কাঁটা বারোটার দু'মিনিট দূরে আর ছোট কাঁটা ন'টার কাছাকাছি। খাস্তগীর একটু চঞ্চল হ'লেন নাকি? ঠিক নটায় আস্‌বেন বন্‌শীলাল মুরারকা।

বন্‌শীলাল মুরারকা। জনগণের সমষ্টিগত স্মৃতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, গণনেতারা একথাটা অনেকদিন জেনে ফেলেছেন। খোদ মুরারকাজীরই আজ তা মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। ঘটনার পর ঘটনা চাপা পড়ে তা একেবারেই অগোচরে চলে গেছে। অরিজিনাল লোটাটাও বোধ হয় আজ নেই, অন্ততঃ খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর একদিন বিদেশী বয়কট আন্দোলনের হুল্লোড়ে একাধারে ডিগনিটি অব লেবারের ছাপ মারা বোম্বাইয়ের চট বাংলার স্বদেশী বাজারে ছেড়ে মুরারকাজী হিন্দী ভাষণের নেতা হয়ে পড়েন। অন্ধ বিদেশী শাসকদের অনুচরেরা মাতালের মত কেবল বিদেশী কাপড়ের দোকান-দ্বারে যোড়হস্ত পিকেটারদেরই যে গরুপেটা করে কয়েদী গাড়ীতে তুলেছে তা নয়, মুরারকাকে দিয়ে বোঝা যায় যে, দেশী কাপড়ের ফিরিওয়ালাকে তারা উপেক্ষা করেনি; ঘটনাক্রমে মুরারকার দুইপুরুষ পিকেটার আর ফিরিওয়ালা-রূপে জেলখানায় মাসকয়েক চক্কর দিয়ে জেল গেটে ভক্ত মালীদের গাঁদা ফুলের মালা গলায় দুলিয়ে দিলেন। এরপর

মুরারকা এণ্ড সন্স দুই নৌকায় পা দিয়ে দিব্যি বৈতরণী পার হয়ে চলেছেন। স্বদেশী আর মুনাফা যে এমন জোড় পায়ে চলে এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পর নিজে কলের কাপড় বেচেও স্বদেহকে খদ্দরের কাপড়েই মুড়ে রাখতেন এবং শোবার সময়েও টেকো মাথার গান্ধী টুপিটা ছাড়তেন না ; সংস্কার-বিরোধী দন্তরাজি প্রকাশ করে বল্‌তেন, উ হি তো লখ্‌স্‌মী।

গোঁড়া অহিংসবাদী হয়েও সভাবিশেষে মুরারকাজী "বঙাল কা" শহীদের প্রতি এমন ঘনীভূত শ্রদ্ধা জানাতে পারতেন যে শুনে বিস্ময় মান্‌তেই হয়। কেমন ক'রে যে এক নিশ্বাসে রিভলভারধারী আর চরকাধারীর সমন্বয় সাধন কর্‌তেন বোঝবার আগেই অবাঙালীর মুখে বাঙালীর প্রশংসায় তোষামোদপ্রিয় বাঙালী শ্রোতারা ঘন ঘন করতালি দিয়ে উঠ্‌ত। সুতরাং দুই নৌকায় ভর দিয়ে দাঁড় চালাবার কৌশলে বড় মুরারকাজী এমনই পোক্ত হ'য়ে উঠলেন যে স্বদেশী বজায় রেখে ১৯৪২এর আগে বা পরে কংগ্রেসের হাত-ছাড়া গণ-আন্দোলন ওকে স্পর্শ তো করতেই পার্‌ল না, কংগ্রেসের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় অসহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও পিঞ্জরাপোলের মুমূর্ষু গরু সিপাহীদের খানায় নিয়মিত পরিবেষণ করতে লাগলেন। হিন্দুত্ব, স্বদেশী ও মুনাফার এমন চমৎকার সন্নিবেশে বহু ভাবী কারবারীরা তাঁর চরণামৃত পাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। যুদ্ধকালে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ যোগ দিয়ে যুদ্ধান্তে দেশদ্রোহী কম্যুনিষ্টদের মুণ্ডপাত তো করলেনই "উনিশশো বিয়ালিশের" ক্রান্তি যে তাঁরই প্রচেষ্টায়, উদ্যোগে

ও কোরবাণীতে সার্থক হ'য়েছে পুস্তিকা, পত্রিকা ও সভার বক্তৃতায় সে কথাই প্রচার করলেন দুনৌকোর দাঁড়ি স্বদেশী বন্‌শীলাল। অহিংস কলের কাপড় বিক্রেতা মুরারকা এণ্ড সন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বড় মুরারকাজী লাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্ম্মীর ছাপ নিয়ে গান্ধীজীর জয়ধ্বনি করে উঠলেন. এবং ইম্ফলের রণাঙ্গণে নেতাজীর যে সহিংস বাহিনী এসেছিল তার ভূয়সী তারিফ জানালেন। কিছুদিনের জন্য যেন বন্দেমাতরম্ ভুলে গিয়ে কেবলই উঠ্‌তে বস্‌তে জয়হিন্দ কর্‌তে লাগলেন। মুরারকা এণ্ড সন্সের নিজস্ব পঞ্চদশ ভবনের শীর্ষে ঝাণ্ডা উঁচা হয়ে রইল। জয়হিন্দ।

বন্‌শীলাল মুরারকা; আস্‌ছেন চেতন খাস্তগীরের সঙ্গে মিলতে।

রেডিওর সঙ্গে মেলানো ঠিক নটায় এসে থাম্‌ল বড় মুরারকাজীর নূতনতম মডেলের গাড়ী চেতন খাস্তগীরের স্বাবলম্বী আশ্রমের জাতীয় পতাকাশোভিত কলাগাছপোতা দুয়ারে।

তারপর সব্বার অগোচরে তাঁদের যুগ্ম সম্মেলন হ'য়ে গেল; আশ্রমকর্মী ব্রহ্মচারী চৈতন্যেরা ঠিক বলে দিতে পারে, এই সম্মেলন তেপ্পান্ন মিনিট সতের সেকেণ্ড স্থায়ী হয়েছিল; তাদের উৎকণ্ঠা নেই, তবু আলোচনার কাল সম্বন্ধে তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না; দ্বিমত ছিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে: বদ্ধদুয়ার খুলে মুরারকাজী যখন বাইরে দৃষ্টিগোচর হলেন। কেউ বলে, তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বেরোলেন; কেউ বলে তিনি

গম্ভীর হ'য়ে বেরোলেন; কেউ বলে তিনি স্মিতহাস্যেই বেরোচ্ছিলেন কিন্তু বাইরে দু'একজন ব্রহ্মচারী প্রহরীকে দেখে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। সুতরাং, সম্মেলনের সফলতা বা বিফলতা নিয়ে একটা চমৎকার গবেষণার অবসর জুটে গেল। সমস্ত গবেষণা থেকে নির্লিপ্ত ব্রহ্মচারীরা এই ক্ষীরটুকু দাঁড় করালেন: (১) হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা কর্‌তে হবে এবং এজন্য প্রচার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে; (২) হিংসাত্মক ভাব কোনমতেই বরদাস্ত করা হবে না, রাষ্ট্রকে নিষ্করুণভাবে তা দমন করতে হবে; (৩) কিষাণ মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের অবাধ অধিকার দিতে হবে।

ছয় ঘণ্টা পর ডাক পড়ল স্বাবলম্বী আশ্রমের বাবার ঘরে স্বাবলম্বী আশ্রমের প্রাচীনতম পোষ্য হরেকৃষ্ণ চৈতন্যের। পায়দলে সহরে যেতে হবে দৈনিক বিকাশরঞ্জনীর অফিসে। কালকেই একটা বিজ্ঞাপন যাবে, ডবল কলাম দুই ইঞ্চি ডিস্‌প্লে, এককোণে এন্টিক টাইপে থাক্‌বে লেখা বহির্বাংলার সোল এজেন্ট মুরারকাজী এণ্ড সন্স, মুরারকা হাউস, ৩৬ নং তপতী সেন লেন, পোঃ আঃ বড়বাজার, কলিকাতা।

দৈনিক বিকাশরঞ্জনী পত্রিকা। আজ একুশ বছর সাধনার পর প্রতিদিন শুভাগত ছত্রিশ কলাম বিজ্ঞাপনের মধ্যে এগারো কলাম বিজ্ঞাপন তাকে দুহাতে অগ্রাহ্য কর্‌তে হয় এবং বাইরে সাগ্রহ বিস্তৃত বাহু গ্রাহক সংখ্যা ছেঁটে ফেলে কম কাগজ বিক্রীতে বেশী রাজস্ব আদায়ের কৌশল চালাতে হয়। বিকাশরঞ্জনী! চিন্তায় ও উচ্চারণে বাংলাদেশের চিত্তে রোমাঞ্চ

জাগে ; বিকাশরঞ্জনীর প্রত্যেক লাইন সংবাদের দাম বিজ্ঞাপনের চাইতেও অনেক বেশী মূল্যবান। কোনমতে একটা লাইন বের করলেই জীবন ধন্য। আজ বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, মাইনেকরা সম্পাদকের তিনদফা কারাবরণের ভেতর দিয়ে বিকাশরঞ্জনীর মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ; দেশে স্বায়ত্তশাসন পাওয়া গেছে। মন্ত্রিত্ব পাওয়া গেছে। আজ আর মাইনে করা জেলখাটা সম্পাদকটি নেই ; তার কাজ ফুরিয়েছে। আজ আর সংগ্রামের কথা নেই, সংগঠনের কথা। জাতি-সংগঠনের কথা। ঠিক যা আছে তাকে রক্ষা নয়, যা আছে তাকে বাড়িয়ে যাওয়া। যার টাকা আছে তার টাকা বাড়বে, যার দারিদ্র্য আছে তার দারিদ্র্য বাড়বে এমন কথা বলা হয়না বটে কিন্তু তার দারিদ্র্য মোচনের জন্য হৈ-চৈ করা চলবে না। স্বায়ত্তশাসনের নবজাত শিশু ঘুমোয়, শিশু ঘুমোয়। বিকাশরঞ্জনীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

বিকাশরঞ্জনীর সাধক-মালিক দ্বৈপায়ন মাইতির প্রিয়তম পুরুষ-বন্ধু রোহিনী তালুকদার এবং প্রেসিডেণ্ট, অখিল ভারত নারী সেবিকা সঙ্ঘ। উল্টাডিঙির একটা ঘুম্‌সি ঘরে আছে "তালুকদার শিশি-বোতল কারখানা" আর টালিগঞ্জের টিনের গুদামে আছে বিলিতী ওষুধ বোতলজাত করার "লেবরেটরী", বিকাশরঞ্জনীর ছাপাখানায় বিনামূল্যে ছাপা লেবেল সাঁটা হয় ক্লাইব ষ্ট্রীটের 'ফেরস ম্যানগনের' লিফ্‌টে-ওঠা চারতলার হেড অফিসে, "তালুকদার রিসার্চ লেবরেটারী।" বিকাশরঞ্জনীর প্রথম পৃষ্ঠায় তার প্রথম সচিত্র বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার রোহিনী তালুকদার এবং

ডিরেক্টরবর্গের মধ্যে আছেন বন্‌শীলাল মুরারকা, চেতন খাস্তগীর, ইব্রাহিম রহমতুল্যা। সচিত্র বিজ্ঞাপন : রোহিনী তালুকদার কি করেছেন আর কুইন ভিক্টোরিয়া কি করেছেন। কোন কোন সময় জিজ্ঞাসা : কলম্বস, না, রোহিনী ? আমেরিকা আবিষ্কারক কলম্বসের আধ-কলাম ছবির পাশে রোহিনীর এক কলাম ছবির দিকে ছ'পয়সার বিকাশরঞ্জনী-পাঠকের একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়।

সেদিন দ্বৈপায়নের এস এস বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ মুরারীচরণ খবর দিল : অসামরিক সরবরাহের লোহা-ঘরের ফুটো দিয়ে কিছুতেই আনা গেলনা দ্বৈপায়নের তিনটি নূতন ইমারতের লোহা আর সিমেন্ট। সেখানকার লোকগুলো অতি সাধু, অতিমাত্রায় সাধু। এস এস বাহিনীর মুরারীচরণ বল্‌ল, যদিও শাস্ত্রে বলে গেছে, সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্।

মাইতি মশাইর দীপ্তোজ্জ্বল মুখের পাইপে দেশলাই সংযোগের লগ্নে দ্বৈপায়নের হাসির তোড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল ঃ

গান্ধী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পূরো ডিস্ আজকাল কত করে হে ?—জান্‌তে চাইলেন দ্বৈপায়ন।

ফস্ করে দেশলাইটা ধরিয়ে মুরারীচরণ দ্বৈপায়নের মুখোজ্জ্বল করে বল্‌ল, জান্‌তে হবে।

যাই হোক, একশ ডিসের অর্ডার দিয়ে বেস্পতিবার বাস্তুহারা সমস্যা সম্বন্ধে যতীন ঘোষকে দিয়ে একটা জোরালো সাংবাদিক সম্মেলন ডাকাও। আর, নগেন নন্দীকে পার্কে পার্কে বিরাট জনসভার জন্য মাইক বাবদ ক্যাসিয়ারকে

আপাতত হাজার টাকা দিতে বল। আর—

শুক্রবার আমার এই ঘরে চেতন খাস্তগীরের সম্বর্ধনায় একটা প্রীতি-সম্মেলন হবে। ভালো জিনিসের জন্য দেশী বিদেশী বাছাই করো না। নেমন্তন্নের তালিকা তোমার কাছে মোটামুটি একটা আছেই, তবু আমাকে একবার দেখিয়ে নিও ; হ্যাঁ, তাতে জুড়ে দিও অখিল ভারত নারী সেবিকা সঙ্ঘের অবৈতনিকা সম্পাদিকা অমলা রায়ের নাম।

শনিবারের সকালে বিকাশরঞ্জনীর প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স করে, নীলাকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো এন্টিক টাইপে ছাপা হ'ল ইংরাজী-গন্ধী এই বাংলা সংবাদটুকু : "রাজনৈতিক মহলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, মন্ত্রিমণ্ডলীতে বাস্তুহারার সমস্যা লইয়া ভীষণ বিরোধ দেখা দিয়াছে এবং কেহ কেহ এরূপ ইঙ্গিত করিতেছেন যে, রোহিনী তালুকদারের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মন্ত্রীসভা গঠনের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য ইহাও প্রকাশ যে, তালুকদার মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মত হইতেছেন না, কিন্তু বিশিষ্ট রাজনীতিকদের অভিমত এই যে, দেশের এই সঙ্কটকালে তাঁহারই মতো একজন নির্লোভ শক্তিমান্‌ পুরুষের নেতৃত্বগ্রহণ অপরিহার্য।"

পত্রিকার অপরাংশে রোহিনীর সংক্ষিপ্ত সচিত্র পরিচয় ;

ইতিমধ্যে পার্কে পার্কের খোলা হাওয়ায় আগুন ধরে গেছে ; বাস্তুত্যাগী সমস্যার সঙ্গে জমি হস্তান্তর ; জমি হস্তান্তরের সঙ্গে গৃহনির্মাণ সমস্যা এবং গৃহনির্মাণ সমস্যার সঙ্গে লোহা সিমেন্ট সংগ্রহের সমস্যা কিরকম অঙ্গাঙ্গিভাবে

জড়িত নকুলেশ্বর মিত্র তাই জ্বালাময়ীভাষায় লোককে জলের মতো বুঝিয়ে লোকের মাথায়ও আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। পরদিন তারই আরও সুসম্বদ্ধ ভাষণ বিকাশরঞ্জনীকে সুসমৃদ্ধ করে তুল্‌ল। শ্রোতা ও পাঠকের মনে কোন সংশয় রইল না যে আজকের দিনে লোহা আর সিমেণ্ট সরবরাহই বাস্তুত্যাগ সমস্যার সমাধান এবং বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা সমাধানে দেশের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান। ভাতকাপড় দুধমাছ বা পিণ্ডারী কাপড় ব্যবসায়ীরা কোন সমস্যাই নয়, সমস্যা লোহা আর সিমেণ্টের অবাধ সরবরাহ এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর পুনর্গঠন।

দ্বৈপায়নের চা মজলিসের পরদিনই আর একটি গুরুতর সংবাদ বেরোল। চেতন খাস্তগীর তাঁর আশ্রম পরিত্যাগ করে মুসলিমস্থানের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ নিরোধের জন্য মৃত্যু-সঙ্কল্প নিয়ে শান্তির ঝাড়ি হাতে মুস্‌লিমস্থানে রওনা হচ্ছেন।

রোহিনী মন্ত্রীসভা আসন্ন, বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা সমাধান অনিবার্য, এবার লোহা, সিমেণ্ট পাওয়া যাবেই, মুরারকাজী বড়বাজারে চাঁদা তুল্‌ছেন।

পক্ষকাল পরে বিকাশরঞ্জনী সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ কর্‌ল, তালুকদার-মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

মুসলিমস্থানে চাঞ্চল্য জেগেছে, ভিটেমাটীর মায়া আজ মায়াই, সেখানে সুরু হয়েছে নিরুদ্দেশের যাত্রা।

প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী নিম্নমধ্যবিত্ত যাদুগোপাল পুরকায়স্থ একদিন মনোকষ্টে বাস্তুত্যাগ করলেন। পড়শীরা অনেকেই গেছে।

মুস্‌লিমস্থানের হিন্দুপাড়াতে চেতন খাস্তগীরের বাণী এল : বাস্তুত্যাগ করে ভীরুরা, ভীরুরা দিনে বারো বার মরে; বীরের মৃত্যুই মৃত্যু এবং মুসলিমের হাতে হিন্দুর মৃত্যু কুরুক্ষেত্রে মৃত্যুর সামিল, কিন্তু অহিংসভাবে।

যাদুগোপাল মায়া কাটিয়েছেন এবং সর্ব্বস্বত্যাগে বাধ্য হয়েই সপরিবারে মুসলিমস্থান ত্যাগ করলেন।

কোল্‌কাতার একখানি গ্যারেজে ৫০৲ টাকা ভাড়া দিয়ে নূতন ভিটের খোঁজে বেরোলেন। বিকাশরঞ্জনীতে জমি উন্নয়ন সংস্থানের বিজ্ঞাপন বেরোয় মস্ত—তারা নাকি পুনর্বসতির ব্যবস্থা সস্তায় করে দিতে পারে। ঠিকানা দেখে যাদুগোপাল যথাস্থানে হাজির হলেন; কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার-রূপে রোহিনীর নাম দেখে আশ্বস্ত হলেন। এঁদের সততায় সন্দেহ করার কি কারণ আছে?

বহুব্যস্ত ম্যানেজার কাগজপত্রের মাঝখান থেকে বহুক্ষণ পর মাথা তুলে বল্‌লেন, জমি চাই? তা, সব প্লটই ত ভর্তি হয়ে গ্যাছে; জানেন ত কোল্‌কাতা থেকে মাত্র ৪০ মাইল; পিত্রালয় ষ্টেশন থেকে ৩৬ মিনিটের পথ, একটা প্লট আছে, তিন কাঠা, চল্‌বে?

আপাততঃ তাই চল্‌বে।

চল্‌বে? দামও খুব বেশী নয়। আমাদের যুদ্ধের আগে কেনা কিনা। ৬০০ টাকা করে কাঠা। তিন ছয়ে আঠার। আর আপনার গিয়ে হস্তান্তর ইত্যাদির খরচ কাঠা পিছু দেড়শ টাকা করে সাড়ে চারশ। পাকা বাড়ী করবেন ত?

আপাতত :—

না, আমাদের প্ল্যানুমত আপনাকে বাড়ী করতে হবে, খুব সস্তায় হবে, কেননা, এই নগরের স্যানিটেসানটা আমাদের দেখতে হবে। মহাত্মা গান্ধী নোংরামী একেবারে সইতে পারতেন না। আপনাকে বাড়ীর প্ল্যান এই ঠিকানায় নিতে হবে—···

মুরারকা এণ্ড সন্স্‌········

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি অবশ্য দফায় দফায় টাকা দিতে পারেন, তবে তাতে সামান্য কিছু বেশী পড়বে।

কত ?

একবারে যেখানে পড়ত বিশ হাজার, সেখানে পড়বে ত্রিশ হাজার, এস্‌বেস্‌টস্‌······

আচ্ছা আসি, যাদুগোপাল উঠলেন।

ম্যানেজার বল্‌লেন, প্রস্‌পেক্টাসটা ফেলে গেলেন, হ্যাঁ, ইব্রাহিম রহমতুল্যা আপনাকে সস্তায় ফার্নিচার...

আচ্ছা, নমস্কার····

নমস্কার, নমস্কার··· ··

যাদুগোপাল বাইরে এসে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন—হারামজাদা।

১৩৫৫ আশ্বিন।

মহাশোক

লোকপ্রিয় প্রিয়রঞ্জন মোহান্তি মারা গেলেন।

অকালমৃত্যু নয়, অপঘাত মৃত্যু। গ্রামসংস্কারে কচুরী-পানা তুল্‌তে গেছলেন, সাপে কাট্‌ল। ওঝা ডাকৃতে না ডাকতেই নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। জাত সাপ।

দুঃসংবাদ। সুতরাং, বাতাসের আগে ছড়ালো। প্রিয়রঞ্জনের অতিঘনিষ্ঠ সাথীরা নিষ্প্রাণ দেহটাকে ঘিরে 'জয় জগন্নাথ' বলে আর্তনাদ কর্‌তে লাগল। সে সংবাদও বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়ল।

এরপরই বোঝা গেল, প্রিয়রঞ্জনের মৃত্যুটা সামান্য। তাঁর মৃত্যুকে উপলক্ষ ক'রে দেশে যে মহাশোক নেমে এল সেইটেই অসামান্য। তার চাইতেও বেশী অসামান্য হ'য়ে দেখা দিল মহাশোকের আয়োজন। অপ্রত্যাশিত সংবাদে দুঃসহ আঘাতের স্তব্ধানুভূতি নয়, স্নায়ুমণ্ডলীর অনুভূতিকে সমগ্র ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রকাশের অসহ্য উত্তেজনা।

তারযোগে "কালকেতু" দৈনিকে যখন সংক্ষিপ্ত সংবাদটা পৌঁছোলো তখন বার্তা-সম্পাদক সংবাদটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে

এমনি অসমাপ্ত বাক্যের মতো তাঁর চিন্তার মোড় ফির্‌ল। সংবাদটার চাইতেও সংবাদটা প্রকাশের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, এতবড় একটা দুঃসংবাদ কিভাবে এমন সুশোভন করে ছড়ানো যায় যাতে লোকে বোঝে বার্তাসম্পাদক

থেকে ছাপাযন্ত্রের লোহার টুকরোগুলো কঁকিয়ে কঁকিয়ে এই ক'টি কথা উচ্চারণ করেছে। সংবাদে দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে বার্তাসম্পাদক হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের আলোড়ন বিলোড়নে মাথার কেশগুচ্ছকে শোকগ্রস্ত করে তুল্লেন।

তড়িৎগতিতে বিশেষ সংস্করণগুলো সহরের চঞ্চলগতিকে সম্মোহিত ক'রে ফেল্ল। সমগ্র সহরে আত্মপ্রযুক্ত ফিস্ফিসানির ১৪৪ ধারা।

মহানাগরিক ষোড়শী গাঙ্গুলীর দোতলা 'সরসী ভবনে'র কুড়িগজ দূরে মহানাগরিকের জমিদারী আওতায় টালিচাপা কাঁচা নর্দমার বস্তিতে এক অসভ্য জাতি বাস করে। এরা কথা কয় বাংলায়, হিন্দীতে, উড়েতে, কদর্য-ভঙ্গীতে ততোধিক কদর্য-ভাষায়—ষষ্ঠীচরণ দীর্ঘাঙ্গী যেখানে নৈশ বিদ্যালয় খুল্তে গিয়ে মার খেয়েছে। সেখান থেকে অকস্মাৎ একটা অসভ্য আর্তনাদ ধোঁয়া-কুণ্ডলীর মতো উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্ল: ওরে বাবারে মারে—আমার কী করে গেলে গো! সবাই চেনে ওর গলা, ও হরিদাসীর গলা, ঝগড়াটে হরিদাসী, রগফোলা ফাটাগলা হরিদাসী, চীৎকার করে সবাইকার বক্তব্য দেবে ডুবিয়ে, ড্যাব্ডেবে মাংসালো হরিদাসী বালখিল্যের মতো একটা স্বামীকে দুই চড়ে ঘরে বসিয়ে রেখে চার বাড়ী বাসন মেজে আসে, কাঁসার মতো গলায় সোয়াতিনটাকার মনিবকে পাঁচটা উচিত কথা শুনিয়ে দেয়, সেই হরিদাসী বালখিল্য যক্ষ্মারোগে সদ্যমরা এতটুকু স্বামীর নিশ্চল দেহের ওপর লুটিয়ে

পড়ে আকাশ ফাটাচ্ছে, যে স্বামী তাকে কোনদিন খাওয়ায়নি, স্বামীকেই সে খাইয়েছে সেই স্বামীর তুক্‌তুকে হৃৎপিণ্ডটা একেবারে থেমে যাওয়ায় বল্‌ছে, ওরে-বাবারে-মারে, আমার কী করে গেলে গো। একেবারে মাটীতে ছিটকে পড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি, দেয়ালে কপাল ঠুকে মাথা ফুলিয়ে ফেল্‌ল হরিদাসী, সাতবার বঁটি দার কাছে ছুটে গেল বালখিল্যের বৌ; না হয়তো অকস্মাৎ বাক্‌রোধ হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, আবার তেমনি অকস্মাৎ বিদ্‌ঘুটে বোয়াল মাছের মতো মুখ করে হাউ হাউ শব্দে লজ্জার মাথা-খাওয়া কান্না কাঁদ্‌তে থাকে।

মাগীর পেটে 'নাথি-মারা' পাশের ঘরের ভাগ্যবান্‌ মৃতদার রতিকান্ত পর্যন্ত হাতে গামছাটা নিয়ে স্তব্ধতাভরে দেখ্‌তে থাকে; বৌটাকে সে বেঁচে থাক্‌তে 'ভাতকাপড়' দেয়নি, পেটে 'নাথি' খেয়ে দাপাদাপি ক'রে তার মারা যাবার পর সে 'দানসাগর'ও করেছে কিন্তু নিমতলা-যাত্রী রতিকান্তর বুকের ওপর পড়ে দাপাদাপি করে বৌটা বল্‌তে পারলনা হরিদাসীর মতো: ওগো আমার কি করে গেলে গো। কিছুই সে করত না সে পরিষ্কার জানে, তবু মরে গিয়ে রতিকান্তর ভোগ কর্‌তে ইচ্ছে করে ড্যাবডেবে মাংসালো হরিদাসীর এই দাপাদাপি। রতিকান্তর নির্ঘাত মৃত্যুতে শোক করার জন্য নাথি খেয়েও বেঁচে রইল না অকালমৃতা বৌটা। তাই রতিকান্ত বিলাপোন্মত্তা হরিদাসীর দিকে নিশ্চল তাকিয়ে থাকে।

পাড়াটা উচ্চকিত করে ঝগড়াটে ফাটাগলা বালখিল্যের

স্ত্রী হরিদাসীর কান্না চল্‌তে থাকে, কোনমতেই থামানো যায় না এই বুনো অসভ্য লজ্জাহীন চীৎকার।

অথচ—

নগরীর দীপাবলী নিভে আসে। ঘরের আশী পাওয়ারের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে মহানাগরিক ষোড়শী গাঙ্গুলী দশওয়াটের সবুজ আলোর নীচে মহাশোকের কথা ভাবতে থাকেন। দোতলা বাড়ীর সম্মুখ সড়কে ডি-সোটো নিউ-মডেলের ভারী ভারী ছায়া এসে থামে। মহানাগরিক শোকে মুহ্যমান। সবুজ আলোয় মাঝে মাঝে ছায়ার রেখা পড়ে। অতলে তলিয়ে যাওয়া নরম সোফাগুলি নিঃশব্দ পদসঞ্চারীদের স্থান করে দেয়। মহানাগরিক নিশ্চল। ঘরের সমষ্টিগত দীর্ঘশ্বাসে ঘরের সবুজ গাঢ় হয়ে আসে। বেদনাদায়ক নিস্তব্ধতা। গাঢ় সবুজ অসহ্য হয়ে আসে।

মহানাগরিক !

মুখপাত্র বেদনার জাল ছিন্ন করেন।

মহানাগরিক, শোকাচ্ছন্ন মহানগরী আপনার বাণীর প্রতীক্ষা কর্‌ছে।

বাণী !

মহানাগরিকের উত্তোলিত মুখমণ্ডলে কাতরতা ও দুঃসহ বেদনা। আজ এই ঘোর রাত্রিতে আমার বাণী; না, না শ্রীমুখোপাধ্যায়, আজ নীরবতাই শোভন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, মহানগরী ভাষা চায়।

মহানাগরিক আবার আড়াইমিনিটের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে যান।

নগর-পিতা পিতৃব্যদের মাংসালো কব্জিতে প্লাষ্টিক বন্ধনীতে আঁটা আধুনিকতম চ্যাপ্টা ঘড়ির সেকেণ্ডের কেশচিক্কণ কাঁটাটি ১৫০ বার ঘুরে আসে।

মহানাগরিক বলেন, শ্রীমুখোপাধ্যায়, এ অভাবনীয়, এ অসত্য, মন কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না…

শ্রীমুখোপাধ্যায় খুসী হ'য়ে বলেন, এই কথাই, শুধু এই কথাই বলুন, রেডিও ষ্টেশন প্রস্তুত, আপনার গাড়ীটিও গ্যারাজের বাইরে রাখতে বলেছি।

মহানাগরিক গাত্রোত্থান করেন। সর্বাঙ্গে তাঁর ডেঙ্গু জ্বরের ব্যথা। একবার নিজের শরীরের দিকে তাকান। পরিধানে পশ্চিমী বাংলার কোচানো ধুতিটা সামান্য বিস্রস্ত, পাৎলা পাঞ্জাবীর নীচে বনেদী মুচ্ছুদ্দির বেনিয়ানটা সুস্পষ্ট, কিন্তু সর্বোপরি ঘিয়ের রংয়ের নরম শাল। ঘাসের চটি জোড়াই পায়ে পায়ে রাখলেন মহানাগরিক ষোড়শী গাঙ্গুলী। শুক্‌নো তোয়ালে দিয়ে ইতিপূর্বেই সযত্নে ঘষে রাখা কেশদামে আর চিরুনী না বুলিয়েই বল্‌লেন, চলুন।

একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, মহানাগরিক। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের পায়ে অস্থিরতার গতি।

তাড়াতাড়ি? মহানাগরিক সদ্যরোগমুক্তের মতো শ্লথগতিতে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নামেন। গাঙ্গুলীভবনের সম্মুখ-সড়কে সারিবদ্ধ বৃহদায়তন গাড়ীগুলো শোভাযাত্রার আকারে রেডিও-ষ্টেশনে এসে থামে।

৭নং মহল্লার নিভা খাস্তগীর ৫নং ডীচ্ লেনের ৩নং ফ্লাটের

প্রথম ঘরখানায় একেবারে আলো নিভিয়ে পায়চারি করছে। রান্নাঘরে ছেলেমেয়েদের খাওয়ার পাট চুকে আসছে। এদের আজও খিদে পায়। ঝি তাগিদ দিচ্ছে, চলে যাবে, রাতে সে এখানে থাকে না। বাসন সে মেজে রেখেই যেতে চায়। কাকীমার নামে দিদিমণি নিভা খাস্তগীরকে রান্নাঘরের শমন জানাতেই ৭নং মহল্লার ৫নং ডৌচ লেনে ৩নং ফ্লাটের প্রথম ঘরখানা ফেটে পড়ে। 'তোমাদের এই একটা কথা কতবার বল্‌তে হবে যে, আজ আমার কিছুতেই খাওয়া হ'তে পারে না? আজও কি খাওয়াটাই বড়?'

নিভা খাস্তগীর এদের নির্বুদ্ধিতায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। একটু আগে জয়া ঝিকে দিয়ে কিনে আনা 'স্বতন্ত্র' দৈনিকের বিশেষ সংস্করণে মোহান্তির জীবিতকালের পাঁচ কলাম ছবিখানা অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে চেষ্টা করে নিভা খাস্তগীর।

পাশের ঘরে কার অভিনয় শোনা যায়, রেডিওর নির্ভুল যান্ত্রিক শব্দ তাকে ভয়াবহ ক'রে তোলে। সোয়া এগারো বছরের ফ্রক-পরা ডলু চম্‌কে-ওঠা নিভা খাস্তগীরকে বার্তা জানিয়ে যায়, মহানাগরিক মোহান্তির স্মৃতিতর্পণ কর্‌ছেন। রেডিও ঘোষক আরও জানিয়েছেন যে প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা এবং ডিপুটী নেতারাও বেতার-কেন্দ্রে হাজির আছেন, সবাই শোক কর্‌বেন।

নিভা খাস্তগীর ধীরে এসে রেডিওর পাশটায় বসে। মর্মাহতা নারীর অপরূপ লেপটে-বসা ভঙ্গি, দর্শকের পক্ষে সান্ত্বনা দেওয়ার অদম্য আগ্রহ সর্বদেহ মন্থিত করে ওঠে।

নিভা খাস্তগীর ঘড়ি-আঁটা নিটোল ডানহাতখানা পাশের চেয়ারে গলিয়ে দেয়।

মহানাগরিক দুঃখের নায়েগ্রা প্রবাহিত ক'রে গর্জন করছেন, মেঘশূন্য সুনীল আকাশ থেকে একি বজ্রপাত! চিরদুঃখিনী পীড়িতা লাঞ্ছিতা বিমর্দিতা ভারতমাতা, একি মহাঘোরক্লেশে পতিত হলি মা, মা, কি বল্‌ব মা, বলার ভাষা কিছু নাই, হৃদয়াবেগ প্রকাশের পথ নাই, কেবলই বারবার কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে আসে, আমার কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে আসে, আমার··· ···কণ্ঠরুদ্ধ ··হ'য়ে আসে, আমার···

হঠাৎ রেডিওটা যেন ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হ'য়ে যায়, মনে হয় নায়েগ্রার জলচূর্ণ এক্ষুণি রেডিওর কুণ্ডলী বেয়ে গলে পড়্‌বে, দূরে বহুদূরের বেহালার রেকর্ড বেজে ওঠে। ষ্টুডিওতে তোলা রেকর্ড।

তারপরই ধরাগলায় ঘোষক জানায়, নিখিল ভারত বেতার, কলিকাতা কেন্দ্র; আপনারা এতক্ষণ মহানাগরিকের স্মৃতিতর্পণ শুনছিলেন; এবার প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা···

অনর্গল অবিরাম অবিচ্ছিন্ন শোকগাঁথা চল্‌তে থাকে; সমগ্র নগর যেন বুকফাটা দুঃখ জানাতে চায়; তক্‌লি সঙ্ঘের আ-হাঁটু ধুতিমান নটবর সিদ্ধান্ত, পতঙ্গরক্ষা সমিতির নিরামিশাষী ত্রিলোচন মাইতি, ফটিক্‌ঝাড় ডাকাতিমামলার সদ্য আন্দামান-ফেরৎ দায়মলী আসামী রসময় বসু, উগ্রহিন্দু জাতীয় সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি হরিদাস মুখোপাধ্যায়, হিন্দুনিধন আন্দোলনের অবিসম্বাদী সর্দার মহম্মদ কলাবাগান

খাঁ, শ্রমিক-শোষণ বণিকসভার ধনাঢ্য সীতারাম পীতারাম, নিঃ বঃ মজদুরতোষণ ইউনিয়নের প্রচার-সচিব কান্তিলাল রায় চৌধুরী এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আসন্ন বিপ্লবী সঙ্ঘের অশ্বিনী আঢ্য। এমনকি, নিভা খাস্তগীর সচকিত হ'য়ে শুনল, ৭নং মহল্লার প্রস্তাবিত ব্যায়ামশালার উনিশ বছরের আবলুসীকায়া মণিকা ভাদুড়ী ওরফে ঘেঁতি।

তারপর একসময় ক্লান্ত বেতারযন্ত্র, উত্তপ্ত রেডিও বাক্স ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। কিন্তু শোকার্ত নগরীর ক্লান্তিও নেই, শ্রান্তিও নেই। রাতভর পরদিনকার শোকশোভাযাত্রার আয়োজন চলে, শোভনতা শালীনতা নীরবতা দীর্ঘতার দিকে লক্ষ্য রেখে কিভাবে একে মর্মস্পর্শী ক'রে তোলা যায় তার তালিকা রচনা, ছক্‌আঁকা নক্সা কাটা চল্‌তে থাকে—শোভাযাত্রার গতিপথ মানচিত্রের সৃষ্টি করে; কিভাবে কোনটুকু করতেই হবে আর কোনটুকু কিছুতেই করা চল্‌বেনা মাথার ঘিলুতে তার বার বার আনাগোনায় স্থায়ী পথরেখা পড়ে।

স্বাভাবিক শোকগ্রস্ত লোকেরা অস্বাভাবিক জনশূন্য সড়কে ভীড় জমাতে থাকে; চালডালের মুদী রাইচরণ তার দোকানের ঝাঁপি তিন ইঞ্চি ফাঁক করতেই দুবছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত তারাচরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে একাদিক্রমে তিন বছরের স্থায়ী পল্টু হাতের সদ্য কেড়ে-নেয়া রসপুষ্ট ইক্ষুদণ্ডটি নিয়ে কিরকম অহিংসভাবে তেড়ে যায় তাই লক্ষ্য করতে থাকে। ক্রমশ অলিগলিতে রাস্তায় সড়কে শোভাযাত্রার সাপ চল্‌তে সুরু করে।

যারা চিরকাল বাগবাজার থেকে ভবানীপুর পায়ে হেঁটে মেরে দেয়, গাড়ীবারান্দার সংক্ষিপ্ত ছায়াটুকু ছাড়া যাদের রোদেই পোড়া অভ্যাস, রেশনের আধপেটা চাল পরিপূরণে কালোবাজারে হাত বাড়াবার যাদের জো নেই, যারা রাঙা আলু, সস্তা পচা টম্যাটো, দুআনা সেরের জলে-ভেজা বাঁধাকপি, ধুলোছাতু খেয়ে নতুবা অমাবস্যা একাদশীর অছিলায় অনশনকে জব্দ করে—তারা, শুধু তারাই, সেই জ্ঞাত অজ্ঞাত জনতাই— তাঁরা নয় যাঁদের পায়ে না হেঁটে হেঁটে গেঁটে বাত আর পায়ের পাতা নরম, সামান্য রোদের ঝলককে নির্বীর্য করতে যাঁরা পঁচিশ টাকা দামের রঙিন গগল্‌স্ চোখে টানেন, ড্রাইভার না থাক্‌লে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন, সমস্ত পণ্যদ্রব্যের 'ভাও' যাঁদের কণ্ঠস্থ, আইন সভার বাড়ীভাড়া বিল যাঁরা বাতিল করতে পারেন, যুদ্ধকালে গরু বেঁচেও যাঁরা সাতমহল্লার জৈন থাকেন, সেই নমস্য মহাজন বাড়ীগাড়ীওয়ালারা নন, অথবা তাঁরা নন যাঁরা নিজের বক্তৃতা ছাড়া কারও বক্তৃতা শোনেন না, ভূমিকা পরিবর্ত্তনে যাঁদের 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা' নেই, যাঁরা একলা চলার নীতিই শ্রেষ্ঠতম মনে করেন, জনতাকে আমলেই আনেন না, সেই শ্রদ্ধেয় গণ-নেতৃবর্গ নন, অজ্ঞাত জনতাই এই শোভা-যাত্রার যাত্রী। চিররুগ্ন, নগ্নপদ, অর্দ্ধভুক্ত এই জনতা মোহান্তির নামে অফুরন্ত যাত্রা ক'রে গেল। পরদিন এই মিছিলের ছবি দৈনিকের তিন কলাম শোভাবর্ধন করবে, জনতার কাউকে চেনা যাবেনা, মাইক্রোফোনের কাছে মহানাগরিকের ক্লোজ-আপ ছবি নয়, অসংখ্য নরমুণ্ডের সমষ্টিগত 'এরিয়াল ভিউ'

মাত্র। পরদিনকার কাগজে এদের শোকগাঁথা কিছু বেরোবে না, তাই এরা নিঃশব্দে পথাতিক্রম করল।

শ্রীচিরঞ্জীব পতিতুণ্ডি 'অপ্রস্তুত' অবস্থায়ই বক্তৃতা দিতে ভালবাসেন এবং বলতে ভালবাসেন তিনি এবিষয়ে প্রস্তুত হ'য়ে আসেননি, কিন্তু—তারপর যা মনে আসে তাই বলেন, বিখ্যাত চিরঞ্জীব পতিভুণ্ডি। একাদিক্রমে ১৭ বছর ৯ মহল্লার নগরপিতা আর ১৪ বছর পরিষদ-সদস্য শ্রীযুক্ত পতিতুণ্ডি; কত মহানাগরিকের উত্থান-পতন হ'ল, কত বর্ণের প্রাদেশিক প্রধানকর্তার আগমন নির্গমন হ'ল কিন্তু বর্ণ-বৈচিত্র্যে শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব জনগণের মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছেন। তাঁর পাশে সর্বদাই জনতা ভীড় করে ব'লে তিনি তাদের স-পণ্য অবাধ সম্মেলনের জন্য নগরে শ্রেষ্ঠতম বাজারটি তৈরী করে দিয়েছেন; তাতে যা রাজস্ব হয় তা রক্ষার জন্য পিপলস ব্যাঙ্ক করে দিয়েছেন, তারই পাশে আর একখানি বাড়ীতে জাতির মেয়েদের কল্যাণে জাতীয় উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনমাস শিক্ষকদের মাইনে বাকী পড়াতে একবার ধর্মঘট হ'লে তিনি একদিনেই কি ক'রে সব নূতন শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন সেই জবরদস্ত খবর নগরে প্রবাদের মতো প্রচলিত, আর কি করে তিনি বস্তি উচ্ছেদ ক'রে তাঁর মায়ের নামে সিনেমা ভবন তুলেছেন তা ইতিহাস হয়ে আছে। এই পতিতুণ্ডির দানেই ৯নং মহল্লার শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামাগারে যে স্বেচ্ছাদল দাঁড়িয়েছে নির্বাচনের পাল্লায় তাদের ওজন অতুলনীয়। বিখ্যাত দেশরত্ন শ্রীচিরঞ্জীব

পতিতুণ্ডি—তাঁরই জানালার বহু নীচু দিয়ে অজ্ঞাত জনতা নীরব শোভাযাত্রা ক'রে গেল। অপ্রস্তুত ভাষণে অভ্যস্ত শ্রীযুক্ত পতিতুণ্ডিরও এই দৃশ্য দেখে কয়েকটা ভাল ভাল শব্দের ঝঙ্কার মগজ নাড়াচাড়া দিয়ে কণ্ঠের দরজা ভেদ করে ঠোঁটের বাঁধ প্রায় ভেঙে ফেল্‌ছিল এমন সময় টেলিফোন আর্তনাদ করে উঠ্‌ল।

টেলিফোন আসে, অসংখ্য অবিরাম টেলিফোন আসে পতিতুণ্ডির। বহু লোকের জবাব দিতে হয়।

তেম্‌নি যত শক্ত দায়িত্ব পড়ে চিরঞ্জীব পতিতুণ্ডির ঘাড়ে। মহানাগরিক মোহান্তির মহাশোকের আয়োজনের ভার দিয়েছেন তাঁরই ওপর। সাতদিন ধরে যে শোকসভা চল্‌বে তার ছত্রিশটি সভার পৌরোহিত্য ইতিমধ্যেই শ্রীপতিতুণ্ডির ঘাড়ে পড়েছে; আরও টেলিফোন আস্‌ছে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানিয়ে। প্রতিবারই পতিতুণ্ডি উদ্যোক্তাদের মাথা-কোটা আবেদন সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করছেন। তিনি হিসেব করে দেখেছেন ছত্রিশটা সভার পৌরোহিত্যের জন্য তাঁকে কয়েক গ্যালন মার্তৈল পোড়াতে হবে। আর নয়। তাই টেলিফোন আস্‌তেই তিনি বলেন, অসম্ভব এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রিসিভার রেখে দেন, মাপ করবেন কথাটা হয়তো অপর পক্ষ শুন্‌তেও পায় না।

শ্রীচিরঞ্জীব পতিতুণ্ডি অন্যমনস্ক। সাতদিনে ছত্রিশটি সভার পৌরোহিত্যের কথা তাঁর একবারও মনে পড়্‌ছেনা, কেবলই মনে পড়ছে মহানাগরিক মহাশোক উদ্‌যাপনের

যে গুরুভার তাঁরই ওপর দিয়েছেন তার কথা। ভাবছেন কি করে এই মহা-শোকানুষ্ঠানটি সর্বরকমে মর্মস্পর্শী হবে। তিনি নগরের শ্রেষ্ঠতম সভাসজ্জাকরকে নিয়োগ করেছেন, বলে দিয়েছেন, বেদীমঞ্চ থেকে সমাজপতি, শিল্পপতি, নগরপতি, অর্থপতি, গৃহপতি, বিচারপতি এবং রূপবতীদের বস্‌বার আসন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র সমুজ্জ্বল হবে, পটভূমিকায় থাক্‌বে যুগদেবতা মোহান্তির জীবন্ত-পরিমিত রেখাচিত্র, তারই নীচে দুল্‌বে শ্বেতপুষ্পের মালিকা, দূরে লুক্কায়িত পাঁচ শ পাওয়ারের আলো এসে ছড়িয়ে পড়বে পরিপ্রেক্ষিতে, শ্বেতপুষ্পের স্তবক থাকবে শ্বেতদণ্ডের গলায় গলায়, নগরের শ্রেষ্ঠতম পুষ্পবিপণি এই পুষ্প চয়ন করবে।

দায়িত্বভার-সমুন্নত শ্রীচিরঞ্জীব পতিতুণ্ডি গবাক্ষের আকাশে তাকিয়ে থাকেন, শুন্‌তে পান, সম্ভবত শুন্‌তে পান নগরের শ্রেষ্ঠতম বেহালাদার রঞ্জিত হালদারের ছড়ির টান। নেপথ্যের সকরুণ সরব শোকস্পন্দন তারই বেহালায় প্রতিধ্বনিত হবে। বেহালাদার হালদার তার সাধনা সুরু করেছে। পাখীর কলতান সুরু হবার আগে সে জাগে, কালো বাক্সটার ডানা থেকে বেহালাটাকে ছাড়িয়ে আনে, ছড়ির কানে মোচড় দিয়ে শিথিল অশ্বপুচ্ছ সটান করে নেয়, নার্সের আল্‌তো ভঙ্গিতে তাতে রঞ্জন বুলিয়ে আনে চারবার, বেগুণে রংয়ের বেহালার কালো চাবিগুলোতে ঘূর্ণি মারে আর রগের তারে সুর মিলোয়, বাঁ কাঁধে সস্নেহে রাখা বেহালাটা ভাঙা চোয়ালে চেপে ধরে, রগের

তারে ঘোড়ার লেজের ছড়ি স্পর্শ করে, একসঙ্গে তার কটার একটা কন্‌কনে আওয়াজ তুলেই পানের ডিবের দিকে এগোয়। সেখান থেকে সে দুটো পান তুলে নেবে, নেবে এক ছিটে চূণ তর্জনীর ডগায় আর হাতের তেলোয় দোক্তা রেখে হা-করা মুখে অর্জ্জুনের মতো অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর চিবোবে না পান, মুখে রস জমে উঠ্‌বে এক কাপ, সুরের লহরী তৃপ্তির মাত্রায় তুলে দিয়ে পিচ্‌ করে বাইরের দেয়ালটা লক্ষ্য করে পিক্‌ ফেল্‌বে সেই এক কাপ। শুধু একটা সুর, কান্নার সুর, টপ্‌টপ্‌ করে রক্ত পড়বে রজন, রগ, কাঠ আর রঞ্জিত হালদারের কষ বেয়ে। পাখীর কলতানের আগে জাগে রঞ্জিত হালদার আর সকলকে ঘুম পাড়িয়ে বেহালাকে ঘুমোতে দেয়। নিজে ঘুমোয় না, শুয়েও আঙুল চাপতে থাকে, বালিশের পাশে আপনিই কাঁধটা যায় কাৎ হয়ে, মহাশোকের আয়োজনে নগরের শ্রেষ্ঠতম বেহালাদার রঞ্জিত হালদারের বিনিদ্র সুর-সাধনা চলছে!

পিয়ানোবাদিকা উষসীর চুল দুল্‌ছে,—অস্ফুট জবার কর্ণকুণ্ডল পিয়ানোর জটিল সুরে নাচ্‌ছে। নগরের শ্রেষ্ঠতমা পিয়ানোবাদিকা উষসী মণ্ডল, কতবার মা শোবার তাগিদ জানিয়ে গেছেন, ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে কোথায় এসে পড়ল, তিনবার কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কতবার নগরের শ্রেষ্ঠতম পিয়ানোবাদিকা উষসী মণ্ডল পিয়ানোর ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে থেকেছে, সেই সুর, সেই রক্ত-নেঙ্‌ড়ানো সুর কিছুতেই আস্‌ছে না উঠে অবাধ্য রীড্‌গুলো থেকে, সমস্ত চুলগুলো

ছড়িয়ে থাকে সাদা দাঁতে মিশি দেয়া পিয়ানোর ওপর কেশরঞ্জনের বিজ্ঞাপনের মতো, সুর, সুর, বর্শির মতো গেঁথে উঠে আসবে প্রতি কুন্তলচূর্ণের ডগা বেয়ে পিয়ানোর সমুদ্র থেকে, যে সুর মহাশোকের মহীরুহে রোমাঞ্চের সঞ্চার করবে। কইএসে সুর, তিন পেয়ালা ঠাণ্ডা কফি ইতিহাসের বাইরে থাকবে, ইতিহাসে স্থান পাবে উষসী মণ্ডলের যন্ত্রোত্থ চূড়ান্ত সুর। সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে সব শেষ, সত্যিই সব শেষ।

প্রারম্ভিক গানের মহড়া দিচ্ছে 'গীতচৈতালীর' সতের থেকে ছত্রিশ বছরের বালকবালিকারা। অন্যায় বয়সে ফ্রকোন্নত বক্ষে দাঁড়ানো চারজন বালিকার পেছনে ছোট্ট টেবিলে রাখা হারমোনিয়াম, তার পেছনে 'গীতচৈতালীর' বাবরীওলা প্রতিষ্ঠাতা সব দাঁত বের করে "সম্মুখে শান্তি" বলতে বলতে চোখ বুঁজে ফেলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বেসুরো বালক বা বালিকার উদ্দেশে ধমকে ওঠেন ও তাল ঠিক রেখে হারমোনিয়ামের বেলোতে টোকা মারার সঙ্গে সঙ্গে বলেন পা—রা—বা—র, যদি 'পারা'র পর 'বার' ঠিক না হয়, আবার বলেন বা—া—া—র, উহুঁ, বা—া—া—র সম্মুখে…

প্রতিষ্ঠাতার পেছনে আর এক সারি বালিকা তাদের পেছনকার সারিবদ্ধ বালকের সান্নিধ্য অনুভব ক'রে সমতালে গাইছে "সম্মুখে শান্তি"……হ্যাঁ এই কোরাস্ সঙ্গীতেই শোকানুষ্ঠানের 'গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ' থম্থমে ক'রে তোলা হবে।

তারপর যথাক্রমে অনুষ্ঠান সম্পাদক শ্রীচিরঞ্জীব পতিতুণ্ডি এবং সভাপতি মহানাগরিক ষোড়শী গাঙ্গুলী তাঁদের ভাষণ দেবেন এবং যথাক্রমে রঞ্জিত হালদার ও উষসী মণ্ডলের বেহালা আর পিয়ানো নেপথ্যে বাজ্‌বে।

তারপরই সমস্ত আলো ঘোলাটে হ'য়ে আস্‌বে, প্রেক্ষাগার মহাতিমিরে পর্যবসিত হবে, ধীরে অতি ধীরে একটা তীর্যক সাদা আলো সেই তিমির বিদীর্ণ করবে; পটভূমিকায় মোহান্তির রেখাঙ্কণে তা পড়বে ছড়িয়ে, দূরে অতি দূরে কি একটা সঙ্গীত ভেসে আস্‌বে, উষসীর চুল দুল্‌বে আর রঞ্জিত হালদারের ছড়ি কাঁপবে—আর বকের মতো একটা লম্বা পা ফেলে ঢুক্‌বে আধুনিক নৃত্য-পটিয়সী পেশাদার নিভা খাস্তগীর, ঘড়ি ধরে দেড় মিনিট বাঁ পা-টাকে সমকোণে দাঁড় করিয়ে রাখবে, পিয়ানোর ইঙ্গিতে দেড় মিনিট পর ডান পা-টাকে টেনে এনে তেম্‌নি সমকোণে দাঁড় করিয়ে রাখবে, আরও দেড় মিনিট পর সমস্ত দেহ যেন ভেঙে আস্‌বে নিভা খাস্তগীরের, মাথার রূপালী মুকুট ঝলমল ক'রে উঠবে, কান পর্যন্ত টানা কাজলের চোখ স্তিমিত হয়ে আস্‌বে আর হাতে ফুটে উঠবে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সংযোগে একটা দুর্বোধ্য মুদ্রা, হাঁটু ভেঙে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে অসহ্য ব্যথা, ডান হাতের মুদ্রার পাশে বাঁ হাতের মুদ্রা, তারপরই কেমন অসাধারণ রকমের যুক্ত-কর, নিভার বহুযত্ন-প্রসাধিত ললাট নেমে আসবে যুক্তকরে, মাথার মুকুটের সাদা সূক্ষ্ম পালকগুলি পাখার হাওয়ায় উড়বে, মোহান্তির উদ্দেশে একটি নমস্কার। তারপর ঐক্যতান ঝঙ্কার

দিয়ে উঠ্‌তেই নাগরার টক্ টক্ শব্দে জাগবে জাতির বেদনা নিভা খাস্তগীরের সর্পোত্থানে, মুদ্রায় মুদ্রায় কটাক্ষে কটাক্ষে পদক্ষেপে পদক্ষেপে জনগণের দুঃসহ ব্যথা লীলায়িত হয়ে উঠবে, বিচিত্র বর্ণের ফোকাস এসে পড়বে লক্ষ্যস্থলে, হর্ষোচ্ছলে এই শোকানুষ্ঠানেও যদি কেউ হাততালি দিয়ে ওঠে তবে তাকে ধম্‌কে দেবার জন্য থাক্‌বে ব্যায়ামাগারের স্বেচ্ছাসেবকেরা।

এই মহাশোকের আয়োজনে ৭নং মহল্লার ৫নং ডীচ্‌ লেনের ৩নং ফ্লাটের প্রথম ঘরখানায় সবুজ আলো জ্বালিয়ে নিভা খাস্তগীর নৃত্যোৎকর্ষে হাঁপিয়ে উঠছে।

১৩৫৫—বৈশাখ

সাংবাদিক সম্মেলন

ছু'মণ দশ সেরী ছ্যাঁচা শরীরটাকে ঘূর্ণায়মান চেয়ারের ঘূর্ণিতে পূব থেকে পশ্চিমে ওজনের কাঁটার মতো স্থির-চঞ্চল রেখে কৌতূহলী সাংবাদিকদের জিগ্‌গেস করলেন মেজর এ ভি ভোস, সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধানতম কর্ণধার ডাঃ ভোস, বিগত তুই মহাযুদ্ধ, ছেচল্লিশের জিন্না-দাঙ্গা, সাতচল্লিশের ভারত-ব্যবচ্ছেদ এবং সর্বোপরি মহাশিশু রাষ্ট্রের জন্মক্ষণেও বিনাশোত্তীর্ণ মেজর এ ভি ভোস। অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের জালে সরকারী দাপ্তরিক পুকুরে অনায়াসে ধৃত "ক্যাপ্টেন" ভোস স্বদেশী রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল বৃটীশ তাঁবেদারির পুরস্কার-স্বরূপ "মেজর" এবং সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের শীর্ষতম পদ পেয়েছেন যে এ ভি ভোস। একান্ত ঘরোয়া সম্বর্ধনা উপলক্ষে চৌরঙ্গীর গ্র্যাণ্ডে বিপরীতমুখীন তুইটি রঙিন তরলাধারের সন্নিবিষ্ট সহর-কোতোয়ালের সঙ্গে কোরাস কলহাস্যের সময় কথাটা ফেনিল উৎক্ষেপে বেরিয়েছিল যে ভোসের রসসিক্ত মুখ-গহ্বর থেকে। সেই মেজর এ ভি ভোস।

বৌবাজারের মোড়ের আসবাবী দোকানে কি একটা খুব নাম-করা বর্মী কাঠে নির্দেশ মতো একেবারে বৃত্তাকারে তৈরী মেজের মাঝখানে ফুটো ক'রে যেন ব'সে থাকেন মেজর। আসলে মেজ্ বা টেবিলটার পেছন দিকে খানিকটা বিভাজ্য বৃত্তাংশ নীচেকার নিঃশব্দ রাবারী চাকার জোরে জুড়ে বা ছেড়ে

দিয়ে আনা-গোনা করা যায়, আর ঐ বিভাজ্য বৃত্তাংশে থাকে ডাঃ ভোসের বিভাগীয় তেরঙ্গা খদ্দরের চিলতে বাঁধা সব ফাইল। লিফ্‌টে তাঁর মেদবহুল দেহের চারতলায় পদার্পণ ক্ষণের দশ মিনিট আগেই লাল কোর্তা-পরা অকম্যুনিষ্ট বেয়ারাররা পেছনের ঐ অংশটুকু বিচ্ছিন্ন ক'রে মেজরের প্রবেশাবকাশ সৃষ্টি ক'রে রাখে। খাঁটী সাহেবদের দেখে-শেখা পদ-চালনায় মেজর ব্যূহে প্রবেশ করেন এবং যে-সব বেয়ারারকে তিনি বাতাসের মতো প্রয়োজনে অনুভব করেন, কিন্তু কখনো চোখ চেয়ে প্রত্যক্ষ করেন না, বিদ্যুৎ-ঘন্টি টেপার ঠিক পনের সেকেণ্ড পর যাদের সুনিশ্চিত উপস্থিতির উদ্দেশে নির্দেশনামা ঘোষণা করেন সেই চিরাদৃষ্ট সদা-প্রস্তুত বেয়ারাররা বিচ্ছিন্নাংশটুকু জুড়ে দিতেই বিরাট্‌ বৃত্তের মধ্যেই ঘূর্ণায়মান কেদারোপবিষ্ট মেজর ডাঃ এ ভি ভোস একটি বিন্দুর মতো বিরাজ করতে থাকেন, তাঁর পেছনে গোল টেবিলের সদ্য সংযুক্ত বিভাজ্যাংশে শ্রেণীবিন্যস্ত থাকে পক্ষী-পালকের ঝাড়নে নির্ধূল ফাইল। ওপরে পুলিতে দিবসে জ্বালানোর বৈদ্যুতিক আলো দীর্ঘ তারে এমনই সুশৃঙ্খল যে গোটা গোল টেবিলের সর্বাংশে বিশেষ আলোক-সম্পাতের জন্য ওকে টানা-হেঁচড়া করা যায়। মাত্রাহীন ঔজ্জ্বল্যের অসূর্যম্পশ্যা ধাতব মস্যাধারগুলো অকারণে সাজানো থাকে ওঁর সেই শ্রেণীবিন্যস্ত ফাইলগুলোর সুমুখটায়—কখনো লিখতে হয় না যে মস্যাধারে লেখনী ডুবিয়ে, লাল বা কালীর নিষ্কলঙ্ক ঠোঁট নিয়ে লেখনীগুলো পড়ে থাকে অকারণেই হাত-পা ছড়ানো

অপ্রয়োজনীয় জমিদারের মতো। গোল টেবিলের ওদিক্‌টায় শক্ত অনেকগুলো চেয়ারে বসেন অভ্যাগতেরা অথবা অনাহূতেরা, ঠিক এখনই যে চেয়ারগুলো অধিকার করে আছেন সাংবাদিকেরা—সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান মারফৎ আধ ঘণ্টা আগে সরকারী আমন্ত্রণের ইঙ্গিতে উপস্থিত সাংবাদিকেরা, সরকারী বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে প্রতি সরকারী মুখপাত্র খাতে বরাদ্দ দু'কলাম পূর্তির কর্তব্যে সমুৎসুক কিন্তু আত্মগৌরবে স্ফীত-নাসা হাওয়েয়ান কামিজে স্মার্ট সাংবাদিকেরা।

একে একে তাঁরা এলেন। এলেন পাৎলুনের পকেটে নোট-খাতা আর কামিজের পকেটে পেন্সিল অথবা ঝরণা-কলম নিয়ে, এলেন রিপোর্টারের নিশ্চিন্ত নির্ভয় পদক্ষেপে এবং ততোধিক সুনিশ্চিত সংশয়-চিত্তে কিন্তু তার চাইতেও স্থির বিশ্বাসে যে, সরকারী সাইক্লোষ্টাইল্ড বক্তব্যের গণ্ডী অমান্য করতে হবে না। তাঁরা এলেন, উদার চিত্তে নিজ হাতেই একখানা চেয়ার টেনে কাউকেই মানি নে গোছের একটু কাণ্যি মেরে বসলেন। এলেন সবাই একটা গুরুত্বপূর্ণ অবতরণিকার আশায়।

আপন পরিবেশে সম্পূর্ণ সমাহিত ও সাংবাদিকগণের পরিচয়-কালে একান্ত উদাসীন মেজর এ ভি ভোস কথা-প্রসঙ্গে সাংবাদিক সনাক্ত করণে বারে বারে ভুল ক'রেও আপন বক্তব্য বলে চলেছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গেই অভিমত শুনতে চেয়ে অপর পক্ষের মুখ-ব্যাদানের পূর্বেই সাংবাদিক

সম্মেলনে উপস্থিত বে-সরকারী শব্দানুলেখকদের উদ্দেশে রেডিওর মতো প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধানতম কর্ণধার।

দিক্-নির্ণয়ের বিচারে পূর্ব এবং মেজর ভোসের বাঁ দিক্কার সাংবাদিকদের কাছে কি বিষয়ে একটা অভিমত চেয়ে ঘূর্ণায়মান চেয়ারের ঘূর্ণিতে পশ্চিমে হেলে ডান দিক্কার কৌতূহলী সাংবাদিকদের জিগ্গেস করলেন মেজর এ ভি ভোস, ইংরাজীতেই : কি রকম মনে করেন, এই পরিকল্পনাটা ?

সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-গতিতে পেছনকার বিভাজ্যাংশে ঘুরে এক তাড়া পোষ্টকার্ড তুলে নিলেন এবং তেমনি বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে আশে-পাশে ও সাম্নেকার সাংবাদিকদের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে তাস-বাঁটার মতো একখানা করে রেখে গেলেন ছাপা কার্ড, ঠিক পোষ্টকার্ডের মতো, তাতে কোণে টিকিট সাঁটায় উন্মুখ এক ইঞ্চি শূন্য চতুষ্কোণ, ওরই উল্টো পিঠে হাতে-লেখা একখানা চিঠির ফোটো-ব্লক।

কেমন মনে করেন ? কার্ডগুলো বাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তথ্য বিতরণ করতে থাকেন মেজর ভোস : এমনি চার লক্ষ ছাপা হয়েছে, কলকাতার তিন লক্ষ পরিবারের নামে আর এক লক্ষ মেস-হোটেলের মতো লোকাবাসে কর্তা ব্যক্তির নামে ছাড়া হবে। যেন আত্মীয়েরই কোন চিঠি। দেখেছেন তো ভেতরকার লেখাটা ? এক জন নাট্যকার-সাহিত্যিককে মোটা টাকা দিয়ে লেখানো, বেশ আবেদশীল, নয় ? তিন বার প্রত্যাখ্যানের পর চতুর্থ বার এইটি আমি গ্রহণ করেছি।

ঠিক যে আবেদনটুকু দরকার। কি মনে করেন পরিকল্পনাটা?

বলেই আভ্যন্তরীণ টেলিফোন রিসিভারটা তুলে বল্লেন, ওয়ান ফাইভ, ইয়েস, ক্যাপ্টেন মিটার? আমি বলছি, আমি এখন এই প্রেস-রিপোর্টারদের নিয়ে বড্ড ব্যস্ত, এখন যেন না কেউ আমায়, ইয়েস,……

রিসিভারটা রেখে বলতে লাগলেন, কি রকম মনে করেন পরিকল্পনাটা (মানে, হাউ ডু ইউ লাইক দ্য আইডিয়া?)… প্রত্যেক পরিবারের কর্তা পাবে একখানি চিঠি। যেন কোন আত্মীয় বা বান্ধব লিখ্‌ছে। দেখেছেন পড়ে? প্রিয়—ব'লে নিজেই পড়্‌তে সুরু করলেন মেজর ভোস, কিন্তু পরক্ষণেই থাম্‌লেন, কোথায় কোন্ মর্যাদায় যেন চিম্‌টি লাগল, বল্‌লেন, আমার আবার ভাল বাংলা আসে না, ঠিক পড়্‌তে পারি না, বৈদ্যুতিক আহ্বানে ঘন্টি টিপলেন, সাতাশ বছরের একটি একান্ত সচিব স্প্রীংয়ে ভর ক'রে হ'ল হাজির, কিছু না ব'লে মেজর ভোস কার্ডখানা এগিয়ে ধর্‌লেন সেখানে বোতাম টেপার দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ঠিক যেখানে এসে দাঁড়ানো উচিত একান্ত সচিবের, মুখে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বল্‌লেন, শুনুন।

জনৈক সাংবাদিক সাহসে ভর ক'রে বললেন, নিজেকে খুব চট্‌পটে মনে করেন, এমন এক জন সাংবাদিকই বল্‌লেন, বল্‌লেন তিনিই, যিনি খুব ভাল জেরা ক'রতে পারেন ব'লে বিশ্বাস রাখেন, তিনিই সর্বপ্রথম গলার চুলকুনিটা কমাবার জন্য বল্‌লেন, মেজর ভোস, ওটা আমরা পড়ে' নেব। আপনি

যদি কলকাতায় কত লোকের অক্ষর-জ্ঞান আছে, তার একটা ধারণা আমাদের দিতে পারেন, তাহ'লে……

মেজর বললেন, আপনি? শ্যামবাজার পত্রিকার? না? ও, বড়বাজার পত্রিকার? আমাদের পটলদা'রই কাগজ। বলেই ঘরোয়া টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বল্‌লেন, ওয়ান্ ও……চ্যাটার্জি? আমি বল্‌ছি। আমি এখন সাংবাদিকদের নিয়ে ব্যস্ত আছি, কেউ যেন না আমাকে বিরক্ত করে, হ্যাঁ…ব'লে আবার রিসিভারটা রেখে দিলেন।

নিজের মনেই বল্‌তে লাগলেন, ইংরেজ থাক্‌তে সংবাদ-পত্রগুলোর যে মনোভাব ছিল, ইংরেজ বিদায়ের পর তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার, পটলদা' এ কথা জানেন ব'লেই ধারণা ছিল।

অপর এক জন সাংবাদিক সালিশীর ভঙ্গিতে বল্‌লেন, আপনি ভুল বুঝবেন না মেজর ভোস, সাংবাদিকেরা চাকর সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার বন্ধু সম্ভবতঃ জান্‌তে চাইছিলেন, বস্তিতেই কলেরা এবং বসন্ত, প্লেগও বটে, বেশী লাগে, সেখানে তো এই পোষ্টকার্ড…

বস্তি? আমি তো জানতাম, কম্যুনিষ্টদের কোন কাগজ নেই। কি হে? বলে অকস্মাৎ সেই একান্ত সচিবের দিকে ঘুরলেন। একান্ত সচিব কি বল্‌তে যাচ্ছিল, মেজর ভোস হঠাৎ ফেটে পড়্‌লেন, নির্বাক্ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাক্‌তে তো তোমায় ডাকিনি, ঐটুকু পোষ্টকার্ড পড়ে' উঠ্‌তে পারছ না? ··

কাকাতুয়া পড়তে সুরু করল ঃ

প্রিয়, অনেক দিন তোমাদের কোন খবর পাইনি। ভয়ানক উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছি তোমাদের কুশল জান্‌তে। নিশ্চয়ই শুনেছ, কেন না, আমরাই যখন সুদূর মফঃস্বল থেকে শুনেছি, ক'লকাতায় একই সঙ্গে কলেরা, বসন্ত আর প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, তোমরা নিশ্চয়ই কলেরা আর প্লেগের ইঞ্জেকসান, বসন্তের টীকা নিয়েছ। জল ফুটিয়ে তো খাবেই, করপোরেশনের জলও, আর ইঁদুর মার্‌বে, হ্যাঁ বাড়ীতে রাখ্‌বে একটা ডি-ডি-টি'র ঔষধ, একটা পিচ্‌কারী। শুন্‌ছি, প্লেগ ক'লকাতায় স্থায়ী বাসা বেঁধেছে এবং রকম দেখে মনে হচ্ছে, এপ্রিলে সব চাইতে ভয়ঙ্করী হ'য়ে দেখা দেবে! সাবধান। ইতি—

শ্রী স, স্বা, বি,

মেজর ভোস বললেন, অর্থাৎ, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ। কিন্তু সে রহস্য ভাঙলাম না। কি রকম মনে করেন পরিকল্পনাটা? বলে একটা মৃদু উপ্‌ উপ্‌ শব্দ ক'রে ঘূর্ণায়মান চেয়ারে একবার সব্বার মুখোমুখি ঘুরে এলেন। অথচ, বলতে লাগলেন মেজর ভোস, অথচ খুব সস্তায় কাজ সেরেছি। বলুন তো কত-তে হ'তে পারে? কার্ডপিছু পড়ছে আমার এক পয়সা, আর ডাক-টিকিট তিন পয়সা, মোট চার পয়সা। সস্তা নয়? চার লক্ষ ছেপেছি.....

তা'হলে দাঁড়ালো, একজন সাংবাদিক সম্ভবত অঙ্ক কষতে যাচ্ছিল। মেজর ভোস অকস্মাৎ উচ্ছসিত হ'য়ে বলে উঠলেন, আর একটা চমৎকার পরিকল্পনা মাথায় এসেছে আমার, আমারই, মৃত্যুর নাচন, ডেথ্ ডান্স, কলেরা-বসন্ত-প্লেগের তাথৈ নৃত্য, টলীউড ষ্টুডিওতে তোলা হ'চ্ছে, ফিনিস্‌ড্ ব্যালেরিয়ান্, মানে শ্রেষ্ঠা নাচিয়ের তদারকে চমৎকার চলচ্চিত্র, বলুন তো কে, গেস্, আন্দাজ করতে থাকুন, বলে মেজর ভোস সরাৎ ক'রে গোল টেবিলটির পেছনকার বিভাজ্যাংশ থেকে এক বিরাট্ বাণ্ডিল নিয়ে সুমুখকার বৃত্তাকারে ফেল্‌লেন এবং বললেন, এ-কথাটা গৌরবের সঙ্গে বল্‌তে চাই, বর্তমান স্বদেশী সরকার, আপনারা যাদের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে বস্তীবাসী বলতে চান, তাদের সম্বন্ধে একটুও উদাসীন নয়, তাদের জন্যই……

বাণ্ডিল খুলে একটা সচিত্র প্রাচীর-পত্র ছড়িয়ে তুললেন তাঁর মাথার বাঁ পাশে, তাঁর ডান দিকে, এমনি দু'বার ঘড়ির পেণ্ডুলামের ঘূর্ণায়মান চেয়ারের সৌজন্যে। কি রকম ইঙ্গিতপূর্ণ দেখুন, কলেরা ইনোকিউলেসানের ইয়া বড় কামানের মতো সিরিঞ্জ আর ঐ ডানা ছড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে কলেরা। নীচে দেখুন, খাবার, জল সাজানো। অর্থাৎ, কার গা বেয়ে ছড়ায়।

জনৈক সাংবাদিক বলতে চেষ্টা করলেন, কলকাতায় আঢাকা খাবার আর আঢাকা আবর্জনা……

তাঁর দিকে কটাক্ষ হেনে মেজর বললেন, প্রসঙ্গত

এ-কথাটাও আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, ভিখিরীর ছদ্মবেশে কম্যুনিষ্টরা ডাষ্টবিন থেকে ময়লা তুলে বুভুক্ষার অভিনয় করে। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমাদের কণ্ট্রোল ব্যবস্থায় না-খেয়ে কারও ডাষ্টবিন ঘাঁটার কোন কারণ নেই। ওটা নির্বোধ জনসাধারণের সহানুভূতি উদ্রেক আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার কম্যুনিষ্ট ছলনা মাত্র। তাই প্রত্যেক ডাষ্টবিনে "ময়লা ছুঁইলে দণ্ডনীয়" এ-কথা ছাপা দেখতে পাবেন।

জনৈক সাংবাদিক তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, সত্যি, ভিখারীরা লেখা-পড়া জানে এ নইলে জানা যেত না তো!

মেজর ভোসের কানে সব কথা যায় না।

তিনি আর একখানা প্রাচীর পত্র টেনে তুলে বল্‌লেন, অদ্ভুত হয়েছে এই ছবিখানা। এক বিয়ে-বাড়ী, কল্পনাটা আমার মাথায় জাগে। দেখুন, এপাশে এক অতি নিটোল সুন্দরী তরুণী, মানে, কিছু মনে করবেন না, লোভনীয়, তার পাশেই বসন্ত-বিকৃত কুৎসিত এই নারী, নীচে লেখা 'ভুলের ফসল', সময় মতো টীকাই সৌন্দর্যের প্রসাধন।

সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা প্রাচীর-পত্র উঠে গেল, থার্ড ক্লাশে দাদের মলমের ক্যানভাসারের মতো অকস্মাৎ ব'লে উঠ্‌লেন মেজর ভোস: য়্যাটম বম্, হিরোসিমা নাগাসাকি নয়, য়্যাটম বমের ধোঁয়ার নীচে ইঁদুর, ইঁদুরের গায়ে প্লেগাক্ষর, নীচে নিবারণী ব্যবস্থা।

একজন সাংবাদিক জিগ্‌গেস করলেন, আগে না কি

কল্‌কাতা বা বাংলায় প্লেগ হ'ত না, এ কি সত্যি যে……

এই মিথ্যাকে মিথ্যে বলে ঘোষণা করতে আমি ঘৃণা বোধ করি। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার আমল থেকে এই প্লেগ আছে, হংকং থেকে আমদানী করা, আগেকার ডাক্তারেরা অজ্ঞতাবশত একে ইংরাজী-সান্নিক বলে চাপা দিয়েছে, এখন……

সান্নিক-রোগীরাই প্লেগ রোগী বলে ভর্তি হচ্ছে, তাই কি মেজর ভোস ?

হ্যাঁ, আপনারা যে-কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, বল্‌তে লাগলেন মেজর ভোস, মহামারী নিবারণে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। নোট করুন, গো-বীজ তৈরীর যে গবেষণাগার আমাদের আছে তাতে সাময়িক ভাবে আরও সহকারী নেয়া হয়েছে একশ, টীকা দেওয়ার স্থায়ী ও অস্থায়ী কেন্দ্র খোলা হয়েছে পাঁচশ, টীকা দেবার জন্য অস্থায়ী টীকাদার ও টীকাদারণী নিযুক্ত করা হয়েছে এক হাজার। কলেরার ইঞ্জেকসানের জন্য স্বেচ্ছাব্রতী ডাক্তার পাওয়া গেছে দু'শ ; প্লেগের ইঞ্জেকসান ওঁরাই দেবেন। এতে এ পর্যন্ত টীকা দেয়া হয়েছে বিশ হাজার, তার মধ্যে পনের হাজার পুরুষ, পাঁচ হাজার স্ত্রী, মোট বয়স্কের সংখ্যা পনের হাজার, শিশুর সংখ্যা পাঁচ হাজার ; প্রথম টীকা হয়েছে পাঁচ হাজারের, ফের টীকা দেয়া হয়েছে পনের হাজারের। ১৫ই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে ঐ সপ্তাহে বসন্তে আক্রান্ত হয়েছে ৪০৫, মানে ভর্তি হয়েছে, আর মারা গেছে ৩০২ ; এর আগেকার সপ্তাহে ছিল যথাক্রমে ৪০০ আর ৩০৪ ; গত বছর এই মাসে আক্রান্ত

হয়েছিল ৩০৪, মারা গেছ্‌ল ৩০০ ; পাঁচ বছর আগে এই মাসে আক্রমণের সংখ্যা ছিল ২০০, মারা গেছ্‌ল ১৯৯। আক্রমণ আর মৃত্যুর হার যে বেড়েছে তার কারণ প্রকোপ বৃদ্ধি নয়, পরিসংখ্যান্ প্রস্তুতির ব্যবস্থা আগের চাইতে উন্নততর হয়েছে, লোকসংখ্যাও বহু গুণে বেড়েছে। আমাদের এই পরিসংখ্যান্ বিভাগটি পরিদর্শনের জন্য শীঘ্রই একজন কমনওয়েলথ বিশেষজ্ঞ আস্‌বেন।

কলেরার হিসাবও, মেজর ভোস বলতে লাগলেন, পরিসংখ্যান্ বিভাগে আগের চাইতে অনেক বৈজ্ঞানিক হয়েছে। খেসারতী ইঞ্জেকসানের পরিমাণও সরকার বাড়িয়ে দিয়েছেন, জলে ক্লোরিণ ঢালা, গঙ্গাজল ব্যবহার নিষেধ করা, আঢাকা খাবার খাওয়ার পরিণাম জানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। সরকার আশা রাখেন, কলেরার সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে সরকার চল্‌তে পারবেন।

তার পর প্লেগ-নিধন যজ্ঞে সরকার কি আয়োজন করেছেন তার একটা বিরাট তালিকা দিলেন। শত শত জোড়া কালো রাবারের উপানহ, গ্যাস ছড়াবার লম্বা লম্বা পিচ্‌কারী, ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা ডি ডি টি, সাইনো গ্যাসিং, কর্মীদের পোষাক, এটা-ওটা, সহস্র সহস্র ইঁদুর-ধরার ফাঁদ। মেজর ভোস বললেন, স্বদেশী সরকারের এ সাঁড়াশী অভিযান বলতে পারেন। আমরা মার্‌ছি প্লেগ, ওঁরা মারছেন কম্যুনিষ্ট, আমাদের ষ্ট্রেপটোমাইসিন, ওঁদের সিকিউরিটি য়্যাক্ট। সমাজ-বিরোধীরা যাবে কোথায় ? কি রকম মনে করেন পরিকল্পনাটা ?

জিগ্‌গেস করলেন সাংবাদিকদের মেজর ভোস। তার পর তেমনি অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে জোড়া হাত ঠিক কপালেও নয়, নাক বরাবর এক সেকেণ্ড রেখেই বল্‌লেন, আচ্ছা!

ভদ্র, অত্যন্ত ভদ্র, অত বড় পদাধিকার করেও অতি ভদ্র মেজর এ ভি ভোস। সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে সাংবাদিকদের প্রথমেই মনে এল কিছু খাবার কথা, ঘণ্টা আড়াই সম্মেলনের পর সন্ধ্যার মুখে পেটের তাগিদ নিবারণ অসম্ভব, সংবাদপত্রের আফিসিক গুদোমেও সাত বার চোয়ানো চা ছাড়া পানীয় কিছু নেই, নয় তো অনামা পাঁউরুটির ছ'পয়সা টুক্‌রো ছাড়া চিবোবার কিছু নেই, পকেটও এমন ভারী নয় যে, চৌরঙ্গীতে ছোটা যাবে।

মস্ত বড় সরকারী বাড়ীর নীচে নেমেই চোখে পড়্‌লো বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরী ইংরেজী এক্স-এর ওপর কলাপাতা দিয়ে ঢাকা পাৎলা বাঁশের পরাতে কাটা পেঁপে, কচি শশা, ছাড়ানো বাতাবি নেবু আর বিরাট বেরং পগড়ীয়া মাথায় ততোধিক বেরং কামিজ আর সাত হাত ধুতি গায়ে ও পরনে দণ্ডায়মান এক নির্বিকার বিক্রেতা। উট্‌কো হ'য়ে বসে এক বেচারা বেচছে চানাচুর—চানাচুরের মাঝখানে এক কাঁসার ঘটি, ঘটিতে অগ্নিকণা, চানাচুর গরম, তারই মাঝে-মাঝে লাল লঙ্কার পতাকা। ঘুগ্‌নি, পাঁঠার ঘুঘনি হাঁকছে গ্রামের নটবর আর হল্‌দে বাক্স নিয়ে ঘুরছে জলি আইসক্রিম। শরতের শেষে বৌবাজারের, চীৎপুরের, কালীঘাট-টালীগঞ্জ-বালীগঞ্জের পদধূলি নিয়ে আসছে ট্রাম, বাস, মোটর, লরী, যান আর

বাহন। কুণ্ডলীর আকারে পদধূলি বায়ু-স্তরে নাচছে, মাধ্যমিক আকর্ষণে নেতিয়ে পড়ছে পগড়ীয়ায়, উট্‌কো মানুষটার গায়ে —পরম বিশুদ্ধ জীবাণুহীন চরণধূলি। একটু দূরে কাটা ঘুড়ির মতো হেল্‌তে-ছুল্‌তে পড়ছে সেই ধূলিকণা ভ্রাম্যমান উনুনে চাপানো তপ্ত কটাহে চঞ্চল পকৌড়ির নরম-গরম গায়ে; ছাঁক্‌নি দিয়ে তুল্‌ছে কাঠি দিয়ে বোনা গোলাকার শাল-পাতায়। জিভে গরম সইয়ে সামলে খাচ্ছে মানুষেই।

কাটা ফল থেকে গরম পকৌড়ি পর্যন্ত দৃষ্টি হেনে স্বাস্থ্য-বিভাগীয় সত্ত সাংবাদিক সম্মেলন বিস্মৃতপ্রায় মানুষ-সাংবাদিকেরা জটলা করছেন দাঁড়িয়ে রাত্রি একটা অবধি সস্তায় জঠরানল নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধানে। বৈজ্ঞানিক ক্ষুন্নিবৃত্তির গবেষণান্তে একটু হেঁটে যার-যার তার-তার হিসেবে বাঙালী রেস্তোরাঁর রেস্তোরাঁয় গন্ধামোদী একটা লম্বা টেবিল দখল করে বসেন সাংবাদিক দল; ডাকে সাড়া পাওয়া যায় না এমন নির্বিকল্প ছোক্‌রাকে খাবারের নাম জানিয়ে ঢিলে দিলেন পাৎলুনে সাঁটা শরীরগুলিকে প্রতীক্ষায়।

ঢুক্‌লো ছ'টো হাত সমকোণে ছড়িয়ে রোজকার এবং প্রায় সবসময়কার খদ্দের জয়চন্দ্র; সরু ফালির মতো এই ঘরের ঐ কালো তেল-কাপড়ে ঢাকা টেবিল জুড়ে আরও যে তিন জন রোজকার এবং প্রায় সব-সময়কার খদ্দের ছিলেন হাঁক দিলেন তাঁরাই, এ কি হ'ল জয়চন্দর, ডানা মেলেছ, উড়বে না কি?

জয়চন্দ্র নাটকীয় ভঙ্গিতে জানালো, এই হাতে কলেরার আর এই হাতে প্লেগের ইঞ্জেকসান, টীকে দিয়েছি মাসেক আগে।

উঃ, কি মারাত্মক বাঁচাই বেঁচে গেলে জয়চন্দর, বল্‌লে কোণার টেবিলে রোজকার এবং প্রায় সব-সময়কার বন্ধু খদ্দের, কিন্তু আমি তোমায় তাল ঠুকে বল্‌তে পারি জয়চন্দর, আমায় তুমি এক কাপ ভরে কলেরার বীজাণু দাও, আমি চায়ের মতো চুমুক দিয়ে খাব, কিচ্ছু হবে না আমার। কলেরা! শুনেছি, গ্রামের পচা পুকুরে কলেরার মল ধুয়ে কলেরা ঘরে-ঘরে ছড়ায়, কিন্তু সহরে কলেরার বীজাণুকে চিংড়ী মাছের মতো রোজ চিবিয়ে হজম ক'রে ফেল্‌ছি আমরা। তিন দিনের ময়লায় উপ্‌চে-পড়া ডাষ্টবিনের পাশে দেখেছো জয়চন্দর সকাল বেলাকার গরম জিলীপির দোকান, কাচের স্বচ্ছতায় বিশ্বাস নেই বলে বেআব্রু ক'রে রাখে লোকতৃষ্টির গোচরে; হাজারো যান-বাহন যেখানে হাজারো বার মরুর কেতন উড়িয়ে যায়, আঢাকা করপোরেশনের ময়লা গাড়ী যেখান দিয়ে পঁচিশ মাইল বেগে আহৃত সম্পদ ছিটিয়ে যায়? দেখেছো কি জয়চন্দর সরকারী প্রহরীর কুয়াসাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে স্রেফ রাস্তায় খোলা টিনের পাত্র থেকে বারে বারে পথক্লান্ত পিয়াসীকে বরফ-মেশানো ঘোলের সরবৎ পান করাতে? রাস্তার পাশে বড় হোটেলের চিতায় চার পয়সার পাৎলা রুটি আর মোগলাই পরোটা তৈরীর কেরামতি চোখে পড়েছে কি কখনো? মেজেয় গড়ানো বনস্পতি ঘি আর

ইঁদুর-আরসুলায় চাটা ঝোলা গুড় নীল মাছির সঙ্গে কেচে তুল্‌তে দেখোনি বুঝি কোন দিন এই মহানগরী কলকাতায়? গ্রামের লোকে পচা মাছ খেয়ে বেঁচেছে কবে? কলকাতা সহরে পচা চিংড়ি খেয়ে বাঁচে না কে? বাজারের ভীড়ে রসবড়া বিক্রী করতে দেখেছ, লুচি-হালুয়া আর নাড়ী-ভুঁড়ির ঘুগুনি, মাটীতে ফেলে মুড়কী তৈরী আর রথের মেলায় পাঁপড়, হোটেলের পচা নর্দমার পাশেই হোটেলের ঢালা ভাত? দেখেছ রেস্তোরাঁর চপ চট্‌কানো? দেখোনি। এতই অভ্যস্ত হ'য়ে গেছ জয়চন্দর যে জানতেও পার না, তোমার শিশু দুধের নামে খাচ্ছে রাস্তার জল, তুমি সরষের তেলের নামে খাচ্ছ মাকুর তেল, ঘিয়ের নামে খাচ্ছ গ্রীজ, ময়দার নামে শ্বেত পাথর, চালের নামে কাঁকর। কলকাতায় ডাষ্টবিন থেকে খাবার খেতে আর হাইড্রাণ্ট থেকে জল পান করতে দেখে আঁৎকে ওঠে এমন বোকা আছে না কি সহরে?

আঃ, এক জন আপত্তি করল, তুমি তো তাদের দলে নও।

না, আমি তাদের দলে যারা সকালে মুড়ির সঙ্গে কলেরা চিবিয়ে খায়, রকের ষ্টল থেকে চায়ের সঙ্গে কলেরায় চুমুক দেয়, পাইস হোটেলে পাইকারী রান্নার ঘ্যাট খায়, ছট্টুলালের ঝোলা খয়েরে মাখা পানের সঙ্গে কলেরা চিবিয়ে খায়, বিকেলে খায় হনুমান সিংয়ের ফুটপাতে ভাজা পকৌড়ি আর রাতে……

থাক্ তোমার হিসেব, সাবধানের মার নেই, আর তা ছাড়া প্লেগের বেলায় তো এ কথা খাটে না?

খাটে না। তাই আয়োজনও হয়েছে বিরাট। কলকাতায় ভাল জল আর ময়লা জলের নল-চালনা হয়েছে অনেক কাল; স্বদেশী সরকারের ভূগর্ভ রেলপথ রচনার অনেক আগেই অবাধ স্বচ্ছন্দে সুড়ঙ্গ-সরণি কেটেছে মুষিকেরা। কলকাতার ফুটপাথে মাটি নেই, প্যারিস বিশেষজ্ঞেরা এসেছেন মাটির খোঁজে; কিন্তু তারও আগে সিমেন্ট কেটেছে দাঁতে প্লেগের বাহক, পুরোণো বাড়ীগুলোকে গোঁপের আগায় ধরে রেখেছে মা বাসুকির মতো এই ইঁদুরেরাই—করপোরেশনের জাগ্রত দৃষ্টি সত্বেও যে একশ' বছরের বাড়ী ভাড়াটে-আশ্রয়প্রার্থীর মাথায় টালি ভাঙ্ছে, নয় তো পচা ইলেক্‌ট্রিক তারের সৌজন্যে পাঁচশ' বার দমকলের ডাক পড়ছে। ইঁদুর এ বাড়ীর ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে, সিষ্টার্ণ-ভগ্ন পায়খানায়, অনাদৃত বন্ধুর কলতলায়, পাঁচ ভাড়াটের আবর্জ্জনাধারে, কোম্পানীর আমলে তৈরী ওপরে ওঠার ধ্বসে-পড়া কাঠের সিঁড়ির ধাপে-ধাপে, ছাদ থেকে নেমে আসা আধখানা জলের পাইপে—ছাদের জল নামে না যে পাইপ বেয়ে, ঝাঁঝরা ছাদ দিয়ে শোবার-ঘরেই ঝরে। ইঁদুর থাকে রান্নাঘরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি রান্না-ঘর আলাদা কিছু থাকে। ইঁদুর, নেংটে, শূকরাকার ও ছুঁচো, সাপেরও সাধ্য নেই যে-ছুঁচো গেলে। ইঁদুর ছাড়া কলকাতা অসম্পূর্ণ, ডাষ্টবিন থেকে রান্না-ঘর, শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর, ওদেরই কাঁধে ভর করেছে প্লেগ, বড়বাজারের ঘিঞ্জি গলিতে আড্ডা গেড়েছে স্থায়ী। কলেরার মল নয়, বসন্তের পূয নয়, লক্ষ্মীর বাহন নয়, প্লেগের বাহন ইঁদুর, প্লেগ-মক্ষিকার চেহারায় দেখা

দিয়েছেন চঞ্চলা লক্ষ্মী, অদৃশ্য গতিবিধি কিন্তু প্রত্যক্ষ মারাত্মক ফল। বড়বাজার থেকে হাসপাতাল অবধি প্লেগের পরিণাম-পরিণয় হয়েছে। প্লেগ, প্লেগই, নিরন্ধন বাড়ীতে উপবাসীর রক্তবমির ক্ষয়রোগও এ নয়, লরী-চাপা নয়, মোটরের ধাক্কা নয়, ট্রামে কাটা নয়, এ, এ ইঁদুর······

ইঁদুর! বলে লাফ দিয়ে উঠ্‌তে গিয়ে টেবিলের গুঁতোয় ছিট্‌কে পড়ে গেলেন এদিককার এক কারি-মোগলাইর খোদ্দের, পায়ের নীচে রুটীর-সন্ধানী ইঁদুর দিয়েছে সুড়্‌সুড়ি; আর ইঁদুর-নাদটি প্রতিধ্বনিত হবার আগেই গোটা রেস্তোরাঁয় নেমে এল নির্জনতার ফাঁকা স্তব্ধতা, চির-মসৃণ পালাবার পথে ইঁদুরের মতো অদৃশ্য হ'ল সবাই।

শুধু গলা থেকে টিকি অবধি কম্ফার্টার জড়িয়ে অচৈতন্য এ পাড়ার কিরীটি রইলেন লম্বা হ'য়ে পড়ে, যাদব রেস্তোরাঁর গরম এক কাপ চোয়ানো চা গলায় ঢাল্‌তে এসেছিলেন স্বদেশী সান্নিকের প্রতিরোধে।

৫
১৩৫৬—অগ্রহায়ণ

গড়ের মাঠ

ময়দানের আধো-ভাঙা ব্যারাক থেকে বহু যত্নে তৈরী অনেকগুলো কালো মসৃণ পথ এদিকে এসেছে, এই গঙ্গার ধারে, গঙ্গা যেখানে হয়েছে হুগলী আর বাঁধা পড়েছে বিধবা ঝিয়ের মতো বন্দর কর্ত্তৃপক্ষের শেকলে। এই গঙ্গার ধারে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ার আমল থেকে যেখানে ইংরেজ বণিক যাতায়াত করেছে, সূতানটী-গোবিন্দপুর একাকার ক'রে বন্দর গড়েছে কলকাতার, সেই গঙ্গার ধারে; সম্ভবতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আমলেরই পরিত্যক্ত এই ছয় বিঘা জমির ওপর গোশালার মতো একতলা বাড়ী, এখানেই দপ্তর বসেছে পুনর্বসতি সচিবের প্রতিভূরূপে কমিশনারের, মাসিক আড়াই হাজার টাকার দেশী কমিশনার, ঠাকুমা যাঁর ত্ব-আনা লাউয়ের লাউঘণ্ট খেয়ে নিমতলায় দেহরক্ষা করেছেন, আড়াই হাজার টাকা একটা লোকের লাগে কিসে, শুধু ব্যাঙ্কে জমা রাখার জন্য পাঁচশ টাকার শাড়ী না কিনলে ভেবে পেতেন না যে ঠাকুমা। পটল, অরুণবাবু বা শ্যামাপদ কুণ্ডু নয়, রায় বাহাত্বর মিঃ সেইনের দপ্তর। পুনর্বসতি বিভাগের কমিশনার রায় বাহাত্বর মিঃ সেইন, ফোন তুলে যিনি অস্ফুটকণ্ঠে বলেন সেইন, নয়তো রায় বাহাত্বর। তাঁরই দপ্তর···গঙ্গার ধারে··· ময়দানের আধোভাঙা ব্যারাক থেকে অনেক দূর, ছয় বিঘা জমির ওপর একতলা গোশালার মতো বাড়ী, দিনের বেলা বহু ব্যস্ততার গুঞ্জন একতলার চুণ-সুড়কি খসিয়ে ফেলতে চায়, রাতের বেলা যেখানে নিস্তব্ধতায় দাগ কেটে আরশুলা আর

কুমীরের মতো টিকটিকি শিকার খুঁজে ফেরে।

নিশিতে এই নিস্তব্ধ পুরীর পাশে পনের বিঘা জমির উপর বহু আরামে তৈরী স্ফুর্তিবাজ ছেলেদের ক্লাব, ইংরাজীতে যাকে বলে জলি বয়েজ ক্লাব, ড্যালহৌসী স্কোয়ারের বিপুল সরকারী দপ্তর যাঁরা দিনের বেলা জাঁকিয়ে তোলেন স্থূল নিতম্বের মাপে তৈরী বিশেষ ঢঙের গদী-আঁটা বড় বড় কেদারাগুলোয় ব'সে আর যাঁরা হুগলীর কারখানায় কারখানায় ধোঁয়া তোলেন, নয়তো ক্লাইব স্ট্রীটের আকাশস্পর্শী বাড়ীগুলোর টেলিফোনে যাঁরা সামান্য হ্যালো ধ্বনিতে জগৎ কাঁপিয়ে তোলেন, একান্তভাবে সেই সব খুসী ছেলেদের ক্লাব···জলি বয়েজ ক্লাব।

দিবসে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে এই ছয় বিঘা জমির ওপর একতলা গোশালার মতো পুনর্বসতির অত বড় বাড়ীটায়, কিন্তু নিশাকালের নিরন্ধ্র অন্ধকারে এ যখন ঘুপটি মেরে থাকে, তখন পনের বিঘার বিপুলাকারে জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের শত সূর্য। পুনর্বসতি দাপ্তরিক ভবনের মেদিপাতার ঘেরাও খোয়া-ওঠানো রাস্তায় দিন-দুপুরে যখন ধরণীর কোলে একটু আশ্রয়ের ভিক্ষায় মাথা কুটে মরে ইসলামা-রাষ্ট্রধর্ষিতা নিঃস্ব-বিধবা, তখন পনের বিঘার স্ফুর্তিবাজী ক্লাবে বিরাজ করে গ্রাম্য শ্মশানের নির্বাক সমাধি। অথবা ছয় বিঘার জমিতে যখন চলে কেওড়াতলার নির্বিকল্প মুখর বহ্ন্যুৎসব, তখন ওখানে থাকে নৈশানন্দের প্রগাঢ় সুষুপ্তি, খরস্রোতা পাকিস্তানী পদ্মার ভাঙা পারে নিরর্থক ভিটা-ছাড়া সনাতনের মা'র অদম্য আকুল

চীৎকারেও যে সুষুপ্তি কুম্ভকর্ণ। গঙ্গার সূর্য অস্ত যায় অনেক দেরীতে, পুনর্বসতি দপ্তরে শ্মশান নামার বহু পরে, কিন্তু তার আগেই সাড়া পড়ে এই পনের বিঘা জমির বাড়ীতে, বিলিয়ার্ড বলগুলোর রেটিনায় বৈদ্যুতিক আলো সঞ্চার করে অসাধারণ সজীবতা, তারপর শত সূর্য জ্বলে টেনিস খেলার প্রমাণ মাপের লনে, কোন অ-সভ্য লোকের চোখে যার কিরণজাল অসহ্য, অথচ এনার্জি সরবরাহের বিল মিটোতে এতটুকু মুখ বিকৃত হয় না জলি ক্লাবের অবৈতনিক প্রধান সচিবের। লোক-কল্যাণে দিনের বেলা সময় পান না এঁরা স্ফূর্তির, তাই রাতের আকাশে ওঠে এঁদের হুকুমের সূর্য। ও-বাড়ী যখন অন্ধকারে অদৃশ্য, এ বাড়ীতে তখন শত সূর্যের জরী।

ময়দান থেকে কতদূর এই পুনর্বসতির কাগজিক ভবন, কত আলকাতরার মসৃণ পথ দাঁড়াস সাপের মতো সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হ'য়েছে এদিকে, সেই সখের প্রাণ গড়ের মাঠ থেকে? গলফ খেলার সীমাহীন হরিৎ ক্ষেতে ঘাঘরাপরা মেমেরা ফিঙের মতো নাচছে যেখানে স্বদেশীদের নির্লজ্জ লোলুপ দৃষ্টিকে দাঁড় করিয়ে, পড়েছে যেখানে গাঢ় সবুজ রঙের নানা রঙের তাঁবু, কোটি টাকায় স্পোর্টসম্যানদের ষ্টেডিয়াম রচনার স্বপ্ন যেখানে সার্থক প্রায়, চাবুকের শাসনে যেখানে তালিম হয় ঘোড়ার নাচনের, মানুষের হাতিয়ার চালনার, প্যাষ্টোরাল যুগের সাথী পরম শ্রদ্ধেয় বিলাতী কুকুরের মেলা, ক্লাইব ষ্ট্রীটের (লঘুচিত্তের নেতাজী রোড নয়) ভাবী চুম্বকদের প্যারাম্বুলেটর আর সতী আয়াদের ভীড়? এখানে কোথায়

মানুষের বসতির স্থান? এ সখের প্রাণের গড়ের মাঠ। এখানে হবে মোটরারোহী স্বাস্থ্যকামীদের *মর্ণিং বোয়াক*, গুরুভোজীদের কসরতী রাইডিং, এখানে খেলা, প্রমোদ, জীবনের ওমর খৈয়ামী পিয়ারীর মৃদু মনোরম স্পর্শ।

মোচার খোলায় একদিন নেমেছিল পেনাঙে জাপানীরা, দুটো হাওয়াই জাহাজও খিদিরপুরে ফেলেছিল পটকা, তারই প্রতিরোধায়োজনে চিরকাল এ ময়দান হতে পারে না সেনা নিবাস অথবা বাঙালী ওয়াকাইর সঙ্গে মার্কিণ বয়ের স্থায়ী রেঁদেভু্য। জাপানীরা বিলুপ্ত হয়েছে হিরোসিমা নাগাসাকিতে, মার্কিণীরা গেছে য়্যাংলো মেয়েকে দুর্বহ উপহারের বোঝায় কাঁদিয়ে। ইংরাজের রাজদণ্ড দেখা দিল বণিকের মানদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী। ১৫ই আগষ্ট। কলকাতার মুসলমান লাঠিয়ালরা পাকিস্থানে গেড়েছে বাস্তুর বাঁশ, উদ্বাস্তু হয়েছে লাখো বিধর্ম্মী কাফের, পাকিস্তানী পদ্মার পার-ভাঙ্গা গৃহস্থ ময়লা কাঁথার পুঁটলি নিয়ে এল গঙ্গার পারে, পুনর্বসতি দপ্তরে মেদি গাছে ঘেরা খোয়া-ওঠা চত্বরে। সখের প্রাণ গড়ের মাঠে জাপানী দঙ্গল নিশ্চিহ্নের আয়োজনে যে সেনানিবাস হয়েছিল তার উৎপাটন চলছে, অক্ষত অপসারণ নয়, হাতুড়ি, কুড়োল, বুলডজারের গুঁতোয় নির্ম্মূল-ক্রিয়া হয়েছে সক্রিয়··· আসামের পাহাড়ী আস্তানায় যুদ্ধান্তে মার্কিণীরা রেডিও, ঘড়ি, ফার্ণিচার, চিকিৎসার ওষুধ যেভাবে রোলারের নীচে গুড়িয়েছে। শূন্য সেনানিবাসে অবশিষ্ট কাঁথা-কড়াই নিয়ে ভিটেছাড়া হাজারো নগেনের মা বড় সাধ করে সংসার

পেতেছিল, লজ্জায় ভেজা কাপড় শুকোবার জন্য দু'গজ নারকেলের দড়ি টানাটানি করে বেঁধে। খালি ঘরে সংসার পেতেছে নগেনের মা, যে নগেনের মা ভাবতেই পারে না অতগুলো ঘর দিবা-রাত মানুষের অভাবে গড়ের মাঠে হাওয়ায় মুখ খুলে হাহা করবে শুধু! গড়ের মাঠে··গড়ের মাঠে আবার সুরু হয়েছে গলফ, তাঁবুতে সান্ধ্যিক বাক্যালাপ, রঙিন তরলিকায় অস্থির দীপ্তি। এখানে ছিন্নকন্থার নগেনের মার বলশেভিকী দৃষ্টিপাত রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে সহরের মাঝখানে বনের বাঘকে ছেড়ে দেয়ার মতো অসম্ভব।

ময়দানী পোড়োবাড়ীর মায়া ছাড়তে চায় না নগেনের মা, শ্বশুরকুলের চৌদ্দ পুরুষের ভিটের মায়া ছেড়েছে যে নগেনের মা অ-না-য়া-সে-ই। এত বড় ব্যারাকটার শেষ দিক-টায়ও পড়েছে হাতুড়ির ঘা, নগেনের মা'র কড়াইতে তখনও শুকনো পোকা-বেগুনের ঘণ্ট চাপানো, সস্তা শেয়ালকাঁটার তেলে শোথ হবার ভয় নেই যে নগেনের মা'র।

পুনর্বসতির পৃথিবীতে রাত্রি নেমেছে ঘন হয়ে সন্ধ্যার পরে পরেই, শতসূর্যের উদয় হয়েছে পনের বিঘার শত সূর্যের দেশে। ছোট ছোট গুল্মের ছায়ায় বসেছে সমাজসেবকেরা, দিনের দায়িত্ব-ক্লিষ্ট পদস্থকে সাহচর্যের নরম স্বাচ্ছন্দ্য দিচ্ছেন সমাজসেবিকারা উইকেট-চেয়ারে চীনাংশুকের শাড়ী এলিয়ে। হাতের ছোট পাৎলা কাঁচের গেলাসটা সস্নেহে লালন করতে করতে পদচারণা করছেন সহর কোতোয়াল, ইংরাজের পাঠশালায় পালিত বহু মৃদু-লাঠি-গুলীচালনার বীরমার্শাল।

বনেদী জমিদার, দশশালা···চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যোগ্য বংশধর রায় হংসবাহন চৌধুরী বয়সকে মানেন না কোন কালেই, তেতলা অবধি তুলেছেন লিফট আর পঞ্চাশ বছরের অপদার্থ শ্রীচরণযুগলে লাগিয়েছেন লাইমুসিনের চক্র, নিঃশব্দ গতিবেগে যার অনিবার্য প্রবেশ ঘটে শতসূর্যের দেশে, এই আলো-ছায়াচ্ছন্ন গুল্মের পাশে। বনেদী জমিদারের মতোই চির-তৃষ্ণার্ত্ত-চিত্ত রায় হংসবাহন। বহুদিনকার নানা রসে সিক্ত জিভটাকে ত্বার হুই ঠোঁটে বুলিয়ে জমানবীশকে সম্বোধন করার মতো বললেন সহর কোতোয়ালকে, এ ধরা সরা মাত্র এই তত্ত্ব গুলে খাওয়ার প্রেরণায় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিলেন যে সহর কোতোয়াল। বললেন, অপদার্থ শাসনযন্ত্র। মাথায়ই আসে না আমার কলকাতা সহরে আর কতকাল এই নোংরামি বরদাস্ত হবে।

হেসে গড়িয়ে পড়েন আর কি সহর কোতোয়াল। সস্নেহে লালিত ছোট পাৎলা কাঁচের গেলাশটা ঠোঁটে ছুঁয়ে বললেন বীর মার্শাল, ভোয়াই, আমার কাজ তো আমি করে যাচ্ছি। একশ চুয়াল্লিশ আর লাঠি আর ময়দান সাফ। এবার হাসির নায়েগ্রা, তুর্দ্ধর্ষ জলধারা দাঁত বের করে গড়িয়ে পড়তে লাগল, মাইকের কাছ থেকে গ্রামোফোন সরিয়ে নেবার মতো সরে পড়লেন হাস্যাধার বীর মার্শাল সহর কোতোয়াল। ছোট্ট তেপায়া টেবিলের ওপর রগ-তোলা হাতের শক্ত মুঠি নামিয়ে আনতে আনতে প্রচণ্ডোত্তাপে বললেন ইতিমধ্যে উপস্থিত রাজস্বসচিব তুর্যোধনের প্রপৌত্র কঙ্কনেশ্বর মালের উদ্দেশে।

বললেন, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, জমিদারকে জমিদার না রাখিলে কে রাখিবে, লেখাপড়া কিছু শিখেছ? আমাদের ভোটের তক্তায় দাঁড় করিয়েছি তোমাকে, হয়েছ সচিব, তক্তাটাকে ভুলেছ। আরও ভুলেছ এক পার ভাঙলে আর পারের জমিতে দামের জ্বর বাড়ে। পদ্মার পার ভেঙেছে, এখানকার জোলো জমি থেকে তোলো রূপো, ম্যালেরিয়া আর হাড়ের সঙঘর্ষে জমিতে পড়ুক সার, একথা তোমায় পই পই করে বলেছি।

পিতৃব্য সম্বোধনে জবাব দিলেন নবীন রাজস্বসচিব, মগজের যুক্তিক্ষেত্রে যদি কিছুমাত্র রক্ত সঞ্চালন হয় তবে সে রক্তে আপনার টান আছে, আমি দুর্যোধনের প্রপৌত্র, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দেব না, এ আমাদের দেউড়ীতে লেখা আছে। ক্যাবিনেটে প্ল্যান হয়েছে। পুনর্বসতি বিভাগ চলবে। চলবে জমি বিলোবার পরিকল্পনা, পুনর্পরিকল্পনা, আরও পরিকল্পনা। শিবিরের ভিখারীদের পেছনে সুনীতির ধ্বজাবাহকদের লাগানো হবে। পদ্মার ভাঙা পারে তারা যাবে না। জমি বিলোনো হবে। সরকারী টাকায় জমি উন্নয়নের কাজ জোলো জায়গায়ই হবে বসুরু…বন্দোবস্ত হবে সরাসরি জমিদার আর সরকারের সঙ্গে, উদ্বাস্তুদের টাকার অঙ্কটা মুছে বসবে জমিদারের অঙ্কের পাশে। এবার কাজ আপনাদের। কেন না আমি সচিব।

কিন্তু মন্ত্রণা আমাদের, অতৃপ্ত-চিত্ত রায় হংসবাহনের আবার উঠল রগ-তোলা হাতের মুঠি। জানি, জমি বন্দোবস্তে

বিরোধই আমাদের পুঁজি। যে যন্ত্র চালু হয়েছে সহজ সংস্কার বুদ্ধিতে। পরিকল্পনা, পুনর্পরিকল্পনা, আরও পরিকল্পনার অনন্ত রচনার উৎস জমি দখলের ব্যর্থ প্রয়াস। সহর কোতোয়ালের উৎখাতী প্রহরণ যেন থাকে উদ্যত। উদ্বাস্তু...

আর বুভুক্ষু, এই তো স্বর্গের স্বর্ণসিঁড়ি নির্ম্মাণের করণ-কারক। নইলে পণ্যের দাম বাড়ে না। হঠাৎ বললেন ভারত উন্নয়ন সমবায় বীমা সমিতির পরিচালন কর্তা এবং বাজে গোবিন্দনগরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরসময় ঘোষ দস্তিদার। পরহিতে, উদ্বাস্তুর বাস্তু সংস্থানে বিঘা পিছু ৪০৲ টাকায় কেনা জমি দেড় হাজার টাকা কাঠায় বিলি বন্দোবস্ত শেষ করে এনেছেন। স্বদেশী কাগজগুলো বিজ্ঞাপনের গণ্ডীতে এমনই মুখ লুকিয়েছে যে, আশা আছে, অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা থেকে ১০ মাইল দূরে এই বাজে গোবিন্দনগর পর্যন্ত বাস, ট্রাম, ইলেক্ট্রিক ট্রেন কিংবা ভূগর্ভের নালী-ট্রেন যাবেই যাবে। আপাততঃ মোটরাধিকারীরাই রেশনের পেট্রোল পুড়িয়ে গৃহনির্ম্মাণের কাজ পরিদর্শন করছেন অবসর-অবকাশে।

কিন্তু চমকে ওঠার স্বভাব নয় স্থিতধী রায় হংসবাহন চৌধুরীর। দশশালা-চিরস্থায়ী আমলের শালুপাতা জমিদারীর ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে বণিকের গজদন্তও যে গেছে রায় চৌধুরীর সে চৈতন্য সজাগ এবং হুগলীর দিকে তাকিয়ে লাল সূর্যাস্তকে তিনি নমস্কার জানান বারেবার। আভিজাত্যের উদ্ধত রক্ত মেনে নিয়েছে একই পেয়ালায়

বণিকের পানাসক্তি। বাজে গোবিন্দপুরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রসময় ঘোষ দস্তিদারকেও তাই সহজভাবে গ্রহণ করেছেন পুরুষানুক্রমিক আভিজাত্যের গাঁট না গুণেই, কর্ম্মসিদ্ধ পুরুষ রসময় ঘোষ দস্তিদার।

‘যেন অনেকক্ষণ থেকেই কথা চলছে, এই ভাবেই জবাব দিলেন রায় চৌধুরী। বললেন, দর্শনের তত্ত্বকথা মনে পড়ে যায় মিঃ ডাষ্টিডার, মানুষের সমাজবন্ধনের ভিৎ সামাজিকতার বোধি নয়, ভিৎ তার একান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা। মোটরে চড়ে ওতোরপাড়া থেকে ব্যায়লা যাবার মতো, মোটরটা গৌণ, ব্যক্তির যাওয়াটাই বড়। উদ্বাস্তু আর বুভুক্ষু যে সোনার সিঁড়ি তৈরীর করণকারক হবে এ কথা পাবেন ডারুইন, ম্যালথাস আর নীৎসের তত্ত্বে।

তত্ত্ব যাই থাক, ভারত উন্নয়ন সমবায় বীমা সমিতির পরিচালনকর্তা এবং বাজে গোবিন্দপুরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রসময় ঘোষ দস্তিদার বাধা দিয়ে বললেন, প্রকাশ করা চলবে খাঁটি বনস্পতি জাতীয় ঘিয়ের মতো। ওতে খাদ্য-প্রাণের অনুপস্থিতি, নিকেল বিষের উপস্থিতি আর অন্ততঃ তৃতীয় পুরুষে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হবার যত আশঙ্কাই থাক, সরকারী নাসারন্ধ্রের ডগায় সুন্দরী মেয়েমানুষের হাতে খাঁটি বনস্পতির কৌটো নাচিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার বিজ্ঞাপনে একমাত্র অধিকারী হতে হবে। জমিহীন সর্বহারার মতো ভাগ করে নিতে হবে জগদ্ধিতায় অনাবাদী জোলো জমি।

সার্থক পুরুষ মিঃ ডাষ্টিডার। রাষ্ট্র আমাদের। আজ আমরা স্বাধীন। জাতীয় স্বার্থ-রক্ষার ভার আমাদের। বাঙলায় বলে জমিদারী, হিন্দীতে বলে জিম্মাদারী, ইংরাজীতে বলে রেসপনসিবিলিটি। পাকিস্তানের শেকড়-ছেঁড়া এক দঙ্গল ভিখিরীর দিকে চেয়ে ক্ষুদিরামী ভাবাবেশে তা আমরা না পারি বিলোতে, না পারি লুটতে দিতে। রাষ্ট্র আমাদের। ভিখিরীর ঝুঁকিও নেই, নাগরিকাধিকার নেই, রাষ্ট্রের চক্ষে সে মানুষই নয়। কাঁকর-মেশানো খুদ-রেশন দোকান-মুখো ছেড়ে না দিয়ে বড় জোর ভিক্ষায় বিলোনো যায়।

বিলিয়ার্ড হল থেকে বেরিয়ে এলেন পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতির নব বাহক রূপচাঁদ টেকচাঁদ, সুন্দর বাঙলা শিখেছেন স্বদেশী কাঠামোয়, বলছিলেন কুসুমিকা মল্লিকাকে, মিসেস মল্লিককে, চির-অনবগুণ্ঠিতা অসূর্যম্পশ্যা নিশাসুন্দরী পরিণতে-পরিণীতা কুসুমিকা মল্লিকা, মল্লিক স্ত্রীয়াং আপ মল্লিকাকে: হামিও সোকথা বুঝিয়ে লিয়েছি, আপনাকে কুছু বোলতে হবে না। সব ঠিক হৈয়ে যাবে। ই বাৎ কখনো হোতে পারে? পাকিস্তান থেকে যিৎনাভি লোক আসবে সবই হামাদের জিম্মাদারী হোবে……

আবদার!

সঙ্গীতের মতো কোথাও কোকিল ডেকে উঠল যেন, রূপচাঁদ টেকচাঁদের কানের পাশেই ছোট্ট একটু কুহু ডাক, কানের ভেতর দিয়ে মগজের রক্তে ভীষণ দোলা দিল এ ডাক। পাগলের মতো, পশ্চিমবঙ্গের খাঁটি বাঙালীর মতো বললেন

রূপচাঁদ টেকচাঁদ, এ হোবে না, এ আপনাকে আমি পোকার বলিয়ে দিচ্ছি।

এদিকটায় খানিকটা ঝোপের ছায়া এসে পড়েছে। ঝিমিয়ে আসছে যেন সমস্ত ক্লাবটা, দুপুর রাতে মাঠের মাঝখানে হঠাৎ থেমে যাওয়া ট্রেনের মতো, কেমন ঝিমোনো ভাব, ঝিমঝিম শব্দ, অথচ হঠাৎ থেমে যাওয়ায় যাত্রীদের জাগার মতো নিঃশব্দ-স্তব্ধতা। টেনিস খেলায় ক্রমশঃ এসেছে ক্লান্তি, বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়রা হয়েছে ক্ষান্ত, পিঙপঙের নাচানাচিতে নেমেছে শ্রান্তি, সোফা, কুসন, উইকেট চেয়ারে এলিয়ে পড়ছে জলি বয়েরা, কোকিলাদের মৃদু কিনিকিনি কিম্বা অকস্মাৎ আকাশচেরা বিদ্যুতের মতো মর্ম্মভেদী হাসি কেমন কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। থামেনি কেবল শত-নির্বাক সাদা আচকান পরা বেয়ারাদের ত্রস্ত আনাগোনা, নানা মৃদু ফরমায়েসের ইঙ্গিতে প্রাণান্ত গতিবেগ। ট্রেতে নানা সামগ্রী, গ্লাসে নানা পানীয়, ঠোঁটে ঠোঁটে তার স্পর্শ, রক্তে রক্তে তার প্রবাহ, বাইরে সারিবদ্ধ সেকালের বীর সেনানীদের চৈতক ঘোড়ার মতো লাইমুসিন প্রভৃতির ঠাণ্ডা স্থির দেহে অনুপরমাণুর গতিচাঞ্চল্য।

ঝিমিয়ে আসছে সমস্ত ক্লাবটি। বাবুর্চিদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে আসছে সব ; সোফারদের ঘুমন্ত দেহে জাগছে সাড়া, কালো লাইমুসিন কূর্ম্মের মতো উঠছে নড়ে, রণক্লান্ত অভিজাতদের এবার তুলে দিতে হবে যার যার চৈতকে। বেয়ারা বাবুর্চিদের পায়ের বেগ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে

যাচ্ছে ঘর থেকে বাইরে ; বাইরের ঝোপ-ঝাপ আলো আঁধার থেকে ইচ্ছাবেগ কুর্মগুলো পর্যন্ত সচরাচর যেমন হয়, সে গণ্ডীও পার হয়ে যাচ্ছে, পার হয়ে যাচ্ছে ম্যানেজারের কঠিন চৌকাঠ, পার হয়ে যাচ্ছে তাদের বাধ্যতামূলক স্বাভাবিক নীরবতার গণ্ডী অথবা স্বল্পবাক স্বভাব, হাঁপানী হাঁপরের মতো শব্দ ক'রে বার বার কি নিবেদন করে, ম্যানেজারের শিথিল ভারী পায়ায় অনিবার্য গতি দেখা দেয়। আলো-আঁধারে এক জায়গায় ভীড়ের প্লাবন দেখা দেয়, ক্লাবের বহির্গামী গতি রোধ করে দাঁড়ায় পরস্পরে। নিঃসহায়ের মতো পরস্পরের দিকে তাকায়। রহস্য অস্পষ্টই থেকে যায়, ক্লাবের বহির্গামী প্লাবনের মুখে পড়ে নিষ্প্রাণ মানুষের বাধ।

নগেনের মা নিজের হাতের ঠিক সাড়ে তিন হাত জায়গা নিয়েছে জলি ক্লাবের প্রবেশ-দ্বারের ভেতরের দিকটায়—শেষ সাড়ে তিন হাত জায়গা। জাগা-ঝিমুনি নয়, পুনর্বসতির সাধনায় নগেনের মার অব্যর্থ নিরবচ্ছিন্ন নিষ্প্রাণ প্রচেষ্টা। মাত্র সাড়ে তিন হাত অস্থায়ী জায়গা। গোটা গড়ের মাঠ নয়, গোটা ক্লাবটি তো নয়ই।

১৩৫৭ বৈশাখ

উপরিসংখ্যান

নর-বানরের রাক্ষুসে কাল থেকে সহস্র শতাব্দীর ছাকনি চুয়ে-চুয়ে এসেছে এই সীতার অগ্নিপরীক্ষা—এসে ঠেকেছে এই পাথুরে কলকাতার শান্-বাঁধানো, নয়তো পীচ-গলা রাস্তায়। এ এক দিনের ঠেলে-দে'য়া গোটা কয়েক মুহূর্তের অগ্নিপরীক্ষা নয় যে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাকেই ইতিহাস করা হবে। লাল্‌চে হলুদ রঙের নরম প্রত্যক্ষ শিখাও নয়, একেবারে অদৃশ্য কম্প্রমান্ আগুন দিয়ে তৈরী গোটা কলকাতার সড়কে গর্দভের বোঝা নিয়ে পদচারণা, বড়বাজারের কচুরী-দলের মতো ঠাসা ভীড়ের ধমক বাঁচিয়ে হাতীবাগান। ঠেলা-গাড়ী ঠেলছে নয়, টানছে নেত্যচরণ—নিত্য প্রতিমুহূর্ত।

প্যাষ্টোরাল যুগে যাযাবর গৃহস্থের পোষ-মানানো পশু গরু-মোষকে ছাড়িয়ে নিয়েছে সি এস পি সি এ, মানুষ দিয়েছে গলা বাড়িয়ে। গরুর শক্ত খুর ঝল্‌সে গলে যায়, মোষের চাম থরথর কাঁপে, চোখে জ্বলে যন্ত্রযুগের বয়লার, ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে পাশব-দরদীর কড়া প্রহরা, ফোস্কা পড়ে না মানুষের খালি পায়ে—নেত্যচরণের, পুলিশকে পয়সা দিয়ে গোঁখানার পূতিগন্ধ নর্দমার পাশে ঠেলা-গাড়ীতে শুয়ে রাত কাটায় যে নেত্যচরণ।

সরীসৃপের গায়ে গড়িয়ে ঘ্যাস করে এসে পড়েছে গদী-আঁটা যন্ত্রযুগের হাওয়ায় পরিতৃপ্ত নিউ মডেলের ট্রাম, মট্‌কায়নি নেত্যচরণের ঘাড়, ঠেলা-গাড়ীতে রেখেছে ঠেকিয়ে,

পায়ে বাজানো টম্‌টমানি ঘণ্টার আরাবে প্রাণ নয়, কান গেল, পাইজীর ট্যাক্সিটা হাঙরের মতো নাকের ডগায় এসে হাঁসের মত ডাক্‌ছে, ডান দিকে জনসংভরণের কীলক ওদিক্‌কার বাস্‌টাকে রেখেছে আগলে। নেত্যচরণের ফোস্কা-না-পড়া চরণ সাদা-গলা আগুনে নৃত্য করে নিত্য, ফোস্কা পড়ে না যান্ত্রিক যুগের মানুষের, মাসে এক দিনও গ্যাস কোম্পানীর ধারে রোগ-জির্‌জিরে উর্বশীর সঙ্গে এক লহমা ইয়ার্কি করার মতো ট্যাঁকে পয়সা নেই যে মানুষের—নেত্যচরণের।

বৃথাই তিনটে ইটের ওপর 'পিসাবখানার' পাশে মাটীর হাঁড়িতে ভাত চড়াবার কথা মগজে কিল্‌বিল্‌ করছে, ভাতের হাঁড়িটা কি এখানেই বসানো যায় না, এই মড়া-পোড়া আগুনে? অতল প্রশান্ত মহাসাগরের ফুটোয় তলিয়ে যাওয়া জনসংভরণের মোটা মুনাফায় ভেজা ধেনো-কাঁকরের চাল হাইড্রাণ্টের ঘোলা জলে টগবগ করে ফুটে উঠবে নাকের ডগা থেকে পাইজীর হাঙর-মুখো ট্যাক্সিটা সরে যেতে না যেতেই, খাবলা মেরে খেয়ে নেবে নেত্যচরণ আগুনের সড়ক থেকে এমনি আগুনের শিখায় দাঁড়িয়ে থেকে। ভীড়ের ধমকে একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ পায়ের নৃত্য করতে করতেই পারে তো হাওয়ায় ধরিয়ে নেবে গজল-গাওয়া বিড়ি, এক টাকা পনের আনায় বাটার কেড্‌স্‌ কিনতে পারে না যে নেত্যচরণ।

ঈথরের তরঙ্গে অদৃশ্য দাবানল, সর্বংসহা ধরণীর করোটিতে কংক্রিটের জতুগৃহ, ঠেলা-গাড়ীর বনজ বাঁশে টাটার চুল্লী, আদিম কঙ্কালের খাঁচায় জঠরানল—নেত্যচরণের, জনসংভরণের

কাঁকরে এপেণ্ডিক্স আজও পাকেনি যে নেত্যচরণের, বনস্পতি ঘিয়ের তেলানো টিনের ঠেলা টেনে বড়বাজার থেকে হাতীবাগান পর্যন্ত প্রতিদিন ইতিহাসোপেক্ষিত দীর্ঘ অগ্নি-পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ নেত্যচরণের। গরুর খুর যেখানে গলে যায়, মোষের নির্লোম চাম যেখানে কেঁপে-কেঁপে ওঠে, সেখানে ফোস্কা পড়ে না নেত্যচরণের খালি পায়ে, বড়বাজার থেকে হাতীবাগান আর কতই বা দূর!

অনেক দূর। অনেক দূর হাতীবাগান। কৃপণের দেয়ালে ফাটলের মত বেরিয়েছে চীৎপুর, ঔদার্যের মতো উপচে পড়েছে বড়বাজার, লাউয়ের ডগার মতো ফেরিওয়ালারা পায়ে জড়িয়ে পথিকের গতিপথ করে মন্থর, সঙ্কীর্ণ, ইঁদুরের মতো চোরাগলিগুলি থেকে বেরোয় ১৯৪৯ সালের ভি এইট ফোর্ড, তবু তো রাতের নূপুর-নিক্কণ তাতানো-দিনে খাটের তলায় ছেঁড়া গামছার মতো নির্বাক্। হাতীবাগান অনেক দূর। বহু লোহার থাম মাথা গজিয়েছে, ফুটপাথে মাথা কুটে কুটে চলার উদার অবকাশ, পানওলা আর মিষ্টিওলার আঢাকা খাবারের কুলকুচি মসৃণ করেছে চীৎপুরের পথ। হাতীবাগান অনেক দূর। অনেক দূর কি?

আশে-পাশে চলেছে দুরন্ত গতিবেগ, কুড়ি মিনিটে বাগবাজার থেকে শাহ্পুর নয়তো টালীগঞ্জ, একটা পানও পুরোপুরি চিবানো হয় না, আশে-পাশে বিদ্যুৎ-গতি, মুহূর্ত দাঁড়াবার অবসর নেই, আগে, আমি আগে; ফাঁসীর দড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠেছে ৪০ ডিগ্রীতে বাঁকানো দু'খানা শক্ত

পা নেত্যচরণের—ঘামে-কাদা যে হু'টো পা-কে এক্ষুণি ৪০ ডিগ্রীতে রেখেই বাঁক নিতে হবে কলিকাতা উন্নয়ন অছিমণ্ডলীর নূতন এভিনিউতে।

হাতীবাগান কতই বা দূর। সিংহানিয়ার বড়বাজারী গুদাম থেকে ভীড়ের কচুরিপানা মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে বড় জোর পাঁচ মিনিট, চার মিনিট, তিন মিনিট? কলিকাতা উন্নয়ন অছিমণ্ডলীর নূতন এভিনিউ, ৪০ মাইল বেগ কী-ই বা এমন? সিংহানিয়ার কাঁকরের গাড়ী ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো আচম্‌কা নগরের রসদভোজী নেতচরণের হাঁটু, পাঁজরার অস্থি আর সেরিবেলামের খানিকটা ঘি উদ্ঘাটিত করে রেখে এক মিনিটে পৌঁছে গেল হাতীবাগান। কতই বা দূর? হাতীবাগান অনেক দূর। বড়বাজারের খাঁটি বনস্পতির টিনগুলো অক্ষত রেখেই হা করে পড়ে আছে, ৪০ ডিগ্রীর বাঁকানো পা'র একটা ৯০ ডিগ্রীতে সোজা ক'রে, আর একটাকে ত্রিশ ডিগ্রীতে ভাঁজ করে হা মেলে শুয়ে আছে নেত্যচরণ। ঘি বের-করা মাথার পাশে চোখ হু'টি স্তিমিত হয়ে এসেছে না কি? হা করে পড়ে আছে নেত্যচরণ, আর তো কাপড় সাম্‌লায় না নেত্যচরণ! কোমরে গোজা হল্‌দে রেশন কার্ডের ওপর সুস্পষ্ট রয়েছে জনসংভরণের নির্বাধ গতিচিহ্ন, এখনও স্পষ্ট রয়েছে নেত্যচরণের নাম, কাঁকর চিবিয়েও এই মাত্র কলিকাতা উন্নয়ন অছিমণ্ডলীকে রক্তের শুল্ক দিয়ে গেল যে নেত্যচরণ। রক্ত ছিল সভ্য স্তব্ধ নেত্যচরণের—কালও গোখানায় নর্দমার পাশে পুলিশকে পয়সা দিয়ে নিজের ঠেলাগাড়ীতে শুয়ে রাত

কাটিয়েছে যে নেত্যচরণ।

সিংহানিয়ার অবাধগতি বিংশ শতাব্দীর রথ এসে থাম্‌ল উত্তর কলিকাতার এক অন্ধ-গলিতে, তমসাচ্ছন্ন তিনটি গুদাম যেখানে গলির তিন দিক্ ঘিরে রেখেছে। গুদাম নয়, কারখানা। পূবের কারখানার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে লোহার সর্‌ষে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে আকাড়া চালের স্তূপে আর মহাগাণিতিকের একে-তিনে চার হয়ে বস্তায় বন্দী হচ্ছে লৌহতণ্ডুলকণা—ময়না তদন্তে নেত্যচরণের অন্ত্রনালীতে পাওয়া গেছল যে সমগোত্রীয়দের।

এক নম্বর গুদামে টিটাগড় থেকে আসছে বস্তাবন্দী আকাড়া চাল, বজবজ থেকে আস্‌ছে লোহার সর্‌ষে আর বাঁকুড়া থেকে কাঁকর তেমনই বস্তায় বস্তায় বন্দী, প্রশস্ত মেঝেয় ঢালাই-লাদাইয়ের পর বন্দী হচ্ছে মাপা ওজনে নেত্যচরণের পেটে অক্ষয় মোক্ষলাভের আশায়। দক্ষিণে দুই নম্বর গুদামে আস্‌ছে, বজবজ থেকে ভাঙা গম, টিটাগড় থেকে নরম নরম শ্বেত পাথরের চূর্ণ তেম্‌নি বস্তাবন্দী হয়ে ঢালাই-লাদাইয়ের পর আবার ছুট্‌ছে লক্ষ্যস্থলে।

তিন নম্বর গুদামের হবে আজ শুভ উদ্বোধন। বিদেশ থেকে এসেছে পিপেয় পিপেয় হোয়াইট অয়েল নয়তো স্পিণ্ড্‌ল অয়েল। আছে তিন জন আই-এস-সি পাশ মাসিক পঁয়তাল্লিশ বেতন যোগ পাঁচ টাকা ডি-এ'র রাসায়নিক; পরিমাণ মতো সর্‌ষে তেলের নির্যাস সোনার কাঠির মতো ছুঁয়ে সর্‌ষে তেলের প্রপাত বইয়ে দিচ্ছে। তারই

পঁয়তাল্লিশটা কাচের বৈয়ম সাজানো হয়েছে উদ্বোধন সভায়, একটু দূরে পোস্তা থেকে আনা কয়েক বস্তা সর্ষে, একটা খোলের স্তূপ, খানিকটা দৃশ্য খানিকটা অদৃশ্য কারখানায় বসানো ডায়নামো, যার সঙ্গে চামড়ার বেল্টে জড়ানো অন্তত ৫টা তেলের কল, যাতে কখনোই সর্ষে তেল মাড়াই হয়'না। দীনেন্দ্র স্ট্রীট থেকে তৈরী করে আনা ঝকঝকে ক্যানেস্তারা, হোয়াইট অয়েল বা স্পিণ্ডল অয়েলের লোহার পিপে। পঁয়তাল্লিশটা কাচের বৈয়ম সাজানো হয়েছে উদ্বোধন সভায়, বিশিষ্ট অভ্যাগতদের নমুনা দেখাবার জন্য—সারা গলিটা জুড়ে যেখানে সাজানো রয়েছে ভেনেস্তা চেয়ার, কেক আর স্যাণ্ডুইচের টেবিল।

গুদামের বা কারখানার পার্টিশান-করা অন্দরমহলের খবর বহির্মহল জানে না, জানে পঁয়তাল্লিশ যোগ পাঁচ টাকার আই-এস-সি পাশ রাসায়নিকেরা; তবুও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব কিছু অভ্যাগতদের দেখাবার আয়োজন হয়েছে, কত সর্ষেয় কত তেল হয়। বহির্মহলে সোনা-রংয়ের সর্ষে তেলের পরিবেশে তিন নম্বর গুদামের ওরফে কারখানার শুভ উদ্বোধন। দেবদারু পাতার গগনভেদী "শহীদ" তোরণ উঠেছে গলির মোড়ে, নীচে সহকার-শাখা আর মঙ্গল-কলস, হাতীবাগান বাজার থেকে আনানো কলা গাছের শীষ আর হিন্দী অখ্ছরে লেখা শুভ লাভ। ৫০ বছর স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর দেশ শিল্পোন্নত হচ্ছে, ব্যবসায়ী বুদ্ধি খুলে গেছে লোকের, চীনে সিঁদূরের জ্বল্জ্বলে জবরদস্তির রাষ্ট্রভাষায় লেখা 'রাম রাম';

তোরণের মাথায় মাইকের চোঙা থেকে অনর্গল এবং অবিরাম ফেটে পড়্ছে লোকের কানে কানে বিজন ঘোষ দস্তিদারের 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম!'

এই বিপুল সর্ষে তেল-শিল্পের উদ্বোধন করবেন বহু সঙ্কট সমালোচনা-নির্বিকার-চিত্ত জনসংভরণ-সচিব। দেখ্লেই শিশু-রাষ্ট্রের প্রতীক বলে মনে হয়, আপনাতে আপনি মস্গুল। সংসারকে যারা জটিল মনে করে, তাদের কাছে উনি যেন একটি সরলাঙ্ক।

লোমহর্ষক বক্তৃতা দিতে পারেন জনসংভরণ সচিব; ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরের ২৮শে তারিখে মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করে ১৯৫২ সালের ২৮শে মে তারিখের মধ্যে, মাত্র ছ'মাসে ভুগোল শিখিয়ে দিলেন নিরক্ষর ও অজ্ঞ দেশবাসীকে, বয়স্কদের শিক্ষাদানের অভিযান যদি সত্যিই কোন দিন সুরু হয়, তবে ভূগোলের শিক্ষাটা ইতিমধ্যেই তিনি করে দিয়েছেন, শিক্ষা বিভাগকে ও নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। আড়াই সের আদা আর চার সের লঙ্কার ব্যাপারী বনপ্রিয়ও ঝরঝরে মুখস্থ বল্তে পারে আর্জেন্টিনা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, পেরু, ইউ পি, সি পি, বোম্বাই, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, বিহার, কাম্স্কাট্কা, রুশিয়া, নরওয়ে, ম্যাঞ্চেষ্টার, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, যবদ্বীপ নয় যাভা; যেমন বল্তে পারে আন্দামানের প্রথম বাঙালী (বাঙাল) উপনিবেশকেরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের স্বর্গীয় সুখ-সম্পদের কথা।

বিশ্বকোষী ক্ষিদে নিয়ে পরিসংখ্যান তত্ত্বকে একটা

হজমিগুলির মতো খেয়ে বসে আছেন জনসংভরণসচিব। যন্ত্রাগার, দুর্গোৎসব বা সিনেমা-ভবন উদ্বোধনকালে, খুচরা পটল-ব্যবসায়ী বা আদার ব্যাপারীদের জলসায় প্রধান অতিথিরূপে, জাতীয় বণিক্ মহামণ্ডলীতে সম্বর্ধিত হয়ে নতুবা বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের সমাবেশে সভাপতিরূপে চমৎকার আমদানী করতে পারেন চাল-ডালের কথাটা সর্বমূলাধার জনসংভরণ বিভাগীয় সচিব। তাঁর দশেন্দ্রিয় দিয়ে ১৯৫১-৫২ সালের সস্তা কাঁদুনে গ্যাসের মতো তাঁর ভাষণিক অঙ্কগুলো এমন ভাবে আকাশ ছেয়ে ফেলে যে, জলের ঝাপ্‌টা দিয়েও নাকের জল আর চোখের জলের প্রয়াগ-সঙ্গম রোধ করা যায় না। শুনে শুনে বেঁচে থাক্‌তে নেত্যচরণের মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে, ছাপা হল্‌দে কাগজ দেখিয়ে তাড়াহুড়োর গুজনে যে ক'টা চাল পাওয়া যাচ্ছে, তা তার ষোলো পুরুষের ভাগ্যে, সাত দিনের চৌদ্দ বেলায় অন্তত পাঁচ-দু'গুণো দশ বেলা না খেয়ে থাক্‌তে হয় না এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বন্দে মাতরমের দেশে, ১৯২৯ সালে জ্ঞান্‌দার হিসেব মতো ইংরাজ আমলে যেমন সাত দিনে সাড়ে তিন দিনের খোরাক মিলত। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে স্বাধীনোত্তর ধর্মভীরু একাদশীর স্বদেশে সপ্তাহে একটা দিনে স্বেচ্ছানশন কিছু নয় অথবা বাকী বেলা ক'টার জন্য কালোবাজারে হাত বাড়ানো এমন কিছু নয় নেত্যচরণের পক্ষে, কলিকাতা উন্নয়ন অছিমণ্ডলীর নূতন এভিনিউয়ে সিংহানিয়ার রথচক্রের চিহ্ন মাথায় নিয়ে হা করে পড়ে আছে যে নেত্যচরণ।

সত্য—শাশ্বত সনাতন অনড় অপরিবর্তনীয় ব'লে মর্মস্পর্শী ছকে বেঁধে ফেলেছেন তাঁর বক্তৃতাকে বহু সঙ্কট-সমালোচনা-নির্বিকার-চিত্ত জনসংভরণ-সচিব। বাঙালীর মতো বহুভাষী হয়েও সরল বাঙলা ভাষায় আসন্ন যক্ষ্মাগারে আশ্রয়প্রত্যাশী ক্ষয়রোগীকেও বুঝিয়ে দেন, বাঙলার অনুর্বর খরখরে মাঠে বিঘা-প্রতি কত বীজে কত ধান গাছ হয়, অথচ তক্তা হয় না; মাঠ থেকে খামারে ধান তুলতে, হস্তান্তরে, গুদামজাতে, ইঁদুরের পেটে কতখানি নিরুদ্দেশ হয় এবং তার পর এত সঙ্কট উত্তরণের পর কত ধানে কত চাল হয়, গুণে অঙ্ক কষে একেবারে ভগ্নাংশ পর্যন্ত ব'লে দিতে পারেন। সোমেশ বোসের পর অঙ্ক যে এত সহজ, এত অনর্গল হতে পারে সর্বজনীন দুর্গোৎসব-মণ্ডপে পূজা উদ্বোধনের প্রধান অতিথিরূপে জনসংভরণ-সচিবের মুখে শোনার আগে কেউ জান্‌ত না। সরল কর নয়, সরল ক'রে দে'য়া। তার পর মিলে ঢুকতে, ঝাড়াই-বাছাইতে, কলের মাড়াই, আবার ঝাড়াই-বাছাইতে, বস্তাবন্দী লেনদেনে, গুদামজাতে, আবার লেনদেনে, লরী লাদাইতে, হস্তান্তরে, নাড়া চাড়ায় ইত্যাদি ইত্যাদি একটা সংখ্যাও বোঝাতে বাকী রাখেন না মোক্ষদায়িনী বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভায়। এট্রোপিন দে'য়ার মতো ঘোলাটে চোখ ক'রে বালিকা ও অভিভাবকেরা আভাস পেতে চেষ্টা করেন চাট্টি চাল খাওয়াতে কি বিপুল বিয়োগান্ত চিন্তা-ভার তাঁর অতটুকু মাথায় লাফালাফি করছে! বীজ থেকে ধান জন্মাবার পর নেত্যচরণের পেটে লৌহতণ্ডুলকণায় পরিণত

হতে সে যে কি দীর্ঘ রোমাঞ্চকর পরিক্রমা, অভিনেতৃবর্গের বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সজ্জনেরা তার একটা অনির্বচনীয় ধারণা নিয়ে বাড়ী ফেরেন।

মিশমিশে কালো নিঃশব্দ-চক্রসঞ্চারী আধুনিকতম ষ্টীম-লাইনের কোলে চড়ে এসে গেছেন উদ্বোধন-কর্তা ঘড়ির কাঁটা দুটো যখন পাঁচটা আর বারোটায় খট্ করে এসে লাগল। যথারীতি বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের সঙ্গে অনুষ্ঠানের সূচনা হল: আমরা সেই মা'কে বন্দনা করি, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা সেই মা! এখানকার রাত্রি জ্যোৎস্নায় চিরশুভ্র, এখানে আনন্দ, শুধু আনন্দ। গাছে গাছে ফুলের শোভারাণী, মিষ্টি হাসি, মিষ্টি কথা, তিনি সুখ দেন, আশীর্বাদ করেন। ত্রিশ কোটি লোকের কলকল-নিনাদ, তাদের ষাট কোটি হাতে অস্ত্র, এতেও মাকে অবলা বলে কে?

অসামান্য সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলতে লাগলেন বাক্‌সিদ্ধ জনসংভরণ-সচিব। ১৯৪৭ সালে দেশ যে স্বাধীন হয়েছে স্মৃতিভ্রষ্ট শ্রোতাদের ১৯৫২ সালেও নিত্য এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রথম সাচিবিক কর্তব্য সেরে তিনি বললেন, "আপনারা যে মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করলেন, এ জন্য আপনারা সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়; আপনারা আমাদের একটা মস্ত ক্ষতি পূরণ করলেন। সর্ষে তেল আমাদের জীবনের এক অপরিহার্য বস্তু; আপনারা সে অভাব পূর্ণ করলেন। আপনারা জানেন, আমাদের এ দেশ"—বলেই ওঁর চিরন্তন

সত্যকে প্রকাশ করতে লাগলেন, অবিরাম অনর্গল; থার্ড ক্লাশের কামরায় 'ল্যাবেঞ্চুসে'র ক্যানভাসারও অত অনর্গল বলতে পারে না; নিন, বসে বসে চুষুন আর সময় কাটান। পাকা শিল্পীর মতো মরুভূমির চিত্র আঁকতে লাগলেন সর্বজনাদৃত জনসংভরণ-সচিব: আমাদের দেশ চালে ঘাট্‌তি, ডালে ঘট্‌তি, মাছে ঘাট্‌তি, কাপড়ে ঘাট্‌তি! এ দেশে মস্‌লা নেই, তেল নেই, আনাজ-তরকারী পর্যন্ত নেই। সব কিছুতে ঘাট্‌তি এ দেশ! এ দেশ দুধে ঘাট্‌তি, ফলে ঘাট্‌তি, ঘিয়ে ঘাট্‌তি, মাখনে ঘাট্‌তি! লোহা নেই, সিমেণ্ট নেই, চুন নেই। চায়ের চিনি নেই, লেখার কাগজ নেই, আছে দু'পাতা চা। আমাদের দেশে চাল হয় মাত্র এত টন (মণ নয়, কেন না এ দেশে টন বললে লোকে চট করে বুঝে ফেলে), ময়দা-আটা নেই, এ সব আনতে হয় বর্মা, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা থেকে। সব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী আমরা। আমাদের ডাল আসে বিহার যুক্তপ্রদেশ থেকে, তেল মস্‌লা আসে কানপুর মানপুর থেকে, এত হাজার মণ মাছ আসে পাকিস্তান থেকে, এত হাজার গাঁইট কাপড় আসে বোম্বে আমেদাবাদ থেকে। হবে না? বলতেই গিলোটিনের মতো নেমে আসে সাচিবিক ভর্ৎসনা: এ জাত জানে শুধু কোঁচা দুলিয়ে হাওয়া খেতে। হ্যাঁ, কোঁচার কথাই যদি হল, তবে কাছার কথাও বলি। ইংরাজ আমলে যার দরকার ছিল, স্বাধীন হবার পর তা অনাবশ্যক। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। কোঁচা-কাছা বাদ দিয়ে

যে কাপড়টুকু বাঁচবে তাই দিয়ে পাঞ্জাবী আর ধুতিটাকে পাশ-বালিশের ওড়ের মতো সেলাই করে দোনালায় পরিণত করতে হবে এবং সেই হবে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাতীয় পোষাক। দেশের কল্যাণে এইটুকু স্বার্থত্যাগও কি আপনারা করতে পারবেন না? ন'মাসে কাপড়ের কলের মালিকেরা ১০০ কোটি টাকা লাভ করেছে, এই হিংসে ক'রে কি হবে? পয়দা বাড়ান। কম্যুনিষ্টদের উস্কানিতে কান দেবেন না, স্বার্থত্যাগ করে, ওদের ১০০ কোটি হোক্, দেশ তো সমৃদ্ধ হবে?……

মাথা দোলাচ্ছেন, ভীষণ মাথা দোলাচ্ছেন বড় সিংহানিয়া; সচিব-বাণীর সুরু থেকেই তিনি কথাগুলোয় সায় দিয়ে আসছিলেন এবং খেয়াল রেখেছিলেন সচিব মহোদয় তাঁর দোলানো মাথা লক্ষ্য করছেন কি না। কিন্তু এবার যেন অল্প বাতাসে কলাপাতা নড়ার মতো, গাঁয়ের পথে গাড়ীটানা বলদের মাথা দুলিয়ে চলার মতো বিত্তশীল মানুষের মাথায় দুলুনি! এ দুলুনি সোজা নয়; বড় সিংহানিয়ার মাথায় দুলুনি, ম্যানেজারের মাথা দুল্‌ল, দুল্‌ল সহকারী ম্যানেজারের, দুল্‌ল আই-এস-সি পাশ-করা রাসায়নিকদের, দুল্‌ল দরোয়ান পিয়ন কুলীদের, দুল্‌ল নয় দুল্‌তে লাগল। গোটা সভাটাই দুলতে লাগল।

দুল্‌ল সিংহানিয়ার আধমণী ভুঁড়িঃ ক্লান্ত সচিব বসে পড়তেই আয়াসে টেনে তুললেন তাঁর দেহভার বড় সিংহানিয়া। চমৎকার বাঙলা জানেন, ১৯৫১ সালে মস্ত এক

এন্ডাউমেণ্ট দে'য়ার পর থেকে তাঁকে বাঙলায় একটা কিছু উপাধি দেওয়ার কানাকানি আশুতোষ মুখার্জি রোড বরাবর বিদ্যুতের মতো ঝলকাচ্ছে বলে মস্ত দৈনিকের মস্ত ষ্টাপ-রিপোর্টার সংবাদ দিয়েছেন। সেই সিংহানিয়া উঠ্‌লেন, বললেন, বেশ বলিয়েছেন, ঠিক বলিয়েছেন, যথার্থ বলিয়েছেন মুন্ত্রী মুহোদয়। মানে হামাদের বাবুগিরি ছোড়তে হবে। এখুন কাজের সোময় আছে। এখুন হামারা মুন্ত্রী মহোদয়কে এই রূপেয়াকা তোড়া দিতে চাই, উমিদ্‌ আছে তিনি ওটা লিয়ে লেবেন! উনি কোন ভাল কাজে ওটা লাগিয়ে দেবেন।...১১১১১৲ টাকা!

সচিব মহোদয় হাত পেতে নিয়ে বললেন, গ্রামোন্নয়নে টাকাটা নিয়োগ করা হবে। সহরের পনেরটা দৈনিকের সংবাদ-সংগ্রাহকেরা সংবাদটা লুফে নিল।

সমগ্র জনমণ্ডলী মাথা নুয়ে দাঁড়াল—মিশমিশে কালো নিঃশব্দ চক্রসঞ্চারী আধুনিকতম ষ্ট্রীমলাইনের কোলে গিয়ে বস্‌লেন জনসংভরণ-সচিব—ষ্ট্রীমলাইন এসে থাম্‌ল বেলগেছের নব-উপনিবেশে। ১৯৫২ সালের কড়া কনট্রোলের দিনেও তিন তলার সাতখানি বাড়ী, বাঙলার তথা ভারতের তথা পৃথিবীর সাত জন বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রম যেখানে আকাশ ফেড়ে-ফুঁড়ে উঠছে।

মিশমিশে কালো গাড়ীখানা সাতখানির একখানি বাড়ীর সুমুখে দাঁড়াতেই দাঁত বের করে বেরিয়ে এলেন সুহৃদ দাশ; বাঙলার সাহিত্য-মুদ্রাকর অবস্থায় ব্ল্যাকমেইল ক'রে সাহিত্যিক

পর্যায়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন যে সুহৃদ দাশ। বাড়ীটার বাইরেটা অভিনব রকমে কালো শ্বেত-পাথরের।

জনসংভরণ-সচিব বললেন, লীগ আমলে ইংরেজ দিয়েছে অসামরিক সরবরাহ বিভাগ, আপনি তাকে করেছেন জনসংভরণ। আপনি চিরঞ্জীব।

বাস্তবিক, জনসংভরণ! সুহৃদ দাশের বাঙলা, চাট্টিখানি কথা নয়; জানে না, জানত না নেত্যচরণ; সাহিত্যজগতে ব্ল্যাকমেইল সাধনায় সিদ্ধপুরুষের মস্তিস্ক-প্রসূত অবিসম্বাদী বাঙলা পরিভাষা; স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শতহস্তেন বাজিনং-নীতিপরায়ণ ব্যক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতার পর এই বা কি মন্দ উপরি পাওনা? উপরিসংখ্যান!

কলকাতার আকাশচুম্বী হর্মমালা গেঁথে তুল্‌তে কত টন চাই সিমেণ্ট, কত হন্দর ইস্পাত, কত লক্ষ ইট, নয়তো কংক্রিটের স্তূপ, চুণ বালি, রাবিশ? সুহৃদ দাশ তা নিয়ে সাহিত্য লিখতে পারে। ল্যাবেঞ্চুস চোষার মতো চুক্‌ চুক করে সে পরিসংখ্যান বলে দিতে পারেন ১৯৫২ সালের জনসংভরণ-সচিব।

৪০ লক্ষ লোকের কলকাতার ৪০টা নূতন এভিনিউতে ৪০ মাইল বেগে চলমান চাকার নীচে ৪০ দিনে ক'টা নেত্যচরণ চাপা পড়ে—৪০ দিন দাঁতে কাঁকর চিবিয়ে?

১৩৫৬ জ্যৈষ্ঠ

সতী

রাষ্ট্রের অন্তস্তল পর্যন্ত কেঁপে উঠছে—কাঁপছে এখনও। মৃগী-রোগীর মতো ঝট্‌কা উত্তালে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে সেতারের মতো মিহি স্পন্দনে এসে থাম্‌লেও লয় হ'য়ে যায়নি একেবারে। কাঁপছে—কাঁপছে এখনও। রাষ্ট্রপাল থেকে সুরু করে দর্জিপাড়ার গোপাল—গোপাল মুখটি পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাবিজ্ঞ প্রধানতম দিক্‌পাল থেকে আশুতোষ-ভবনের দ্বারপাল পর্যন্ত সবার হৃদপিণ্ডের কয়েক ঝলক রক্ত সূক্ষ্ম নাড়ী বেয়ে আচম্‌কা থেমেছে কর্টেক্সে। স্নাতকোত্তর ক্লাশে ভর্তি হবার চাঁদা দিতে গিয়ে রসিদ বই নিশ্চয়ই চাইতে হয়েছে যে দপ্তরী ছোঁড়ার কাছে, তার নির্লিপ্ত চলনভঙ্গি আর মাত্‌বরী দৃষ্টি স্থির হ'য়ে গেছ্‌ল এই আকস্মিক ধাক্কায়, যেমন হ'য়েছিল অতি-রসিক রেজিষ্ট্রারের মহিষী-চক্ষুতারা। এই কম্পনের এপিসেণ্টার ধরা পড়েছে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতায়। গুরুর আদেশে আকন্দ-রসপায়ী আরুণি উদ্দালকের দেশে বহু যত্ন-রচিত সুনীতি সঙ্ঘের প্রাচীর ধ্বসিয়ে দিয়েছে ১৯৪৯ সালের বেণীর বংশ। কস্মিন্‌কালেও এই নিষ্কলুষ দেশে যা হয়নি, তাই তারা করেছে, পরীক্ষায় তারা নকল করেছে, নকল করতে না দিলে পাহারাদারকে মেরে ফেলেছে। অন্যথা-নিষ্পাপ এই ভূখণ্ডে, এই একটি মাত্র পাপে ভয়ানক মস্তিস্ক-কম্প হয়েছে সাধু-সমাজে। স্নাতকোত্তর বিভাগে আবেদক ছাত্রের প্রতি লক্ষ্যহীন ইচ্ছা-মন্থর ছোকরা দপ্তরী

রসিদ বইয়ের খোলা পাতা সাম্‌নে রেখে ছাত্র-দুর্নীতির কথায় চিন্তাকুল হয়ে পড়েছে—পড়্‌ছে এখনও, যেমন উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন বাংলার সুযোগ্য বিচার-সচিব।

তিনি পৌরোহিত্য করবেন আজকের ছাত্র-দুর্নীতি দিবস উদ্‌যাপনের জনসভায়—সভানুষ্ঠানের পূর্বেই বিজ্ঞাপিত 'বিরাট' জনসভায়। ভারতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অভিধানখানি মাথায় লাগিয়ে ভাবছেন বিচার-সচিব আজকের সারগর্ভ মর্মস্পর্শী বক্তৃতার চোখা-চোখা কথাগুলো। স্ত্রী-সহোদর পুণ্ডরীকাক্ষের মামলা-নিষ্কৃতির জটিল রন্ধ্রে আজ আর প্রবেশের সময় নেই, আজ ভাবছেন এমন কতগুলো কথা, যা কাল্‌কের সরকারী বিজ্ঞাপনে-কেনা দৈনিকের সম্পাদকীয়তে ইণ্ডেণ্ট দিয়ে উদ্‌ধৃত হবে শুধু এই মন্তব্যটি জুড়ে দিতে যে,—

"আমরা দেশের সকল শুভানুধ্যায়ী, কল্যাণকামী বিশিষ্ট ব্যক্তি, অভিভাবক এবং সাধু ছাত্র-সমাজের দৃষ্টি উপরোক্ত উদ্‌ধৃতির প্রতি আকর্ষণ করি। মাননীয় বিচার-সচিব আজ বিপন্ন ভারতীয় সমাজের সম্মুখে যে সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আমরা মনে করি, ইহা বিচার-সচিবের উপযুক্ত কাজই তিনি করিয়াছেন। দেশের এই সঙ্কট ক্ষণে এক দল লোক যখন দেশের সকল কিছু বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন ছাত্রগণের মধ্যে এই অনিয়মানুবর্তিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি কোনক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। বিচার-সচিবের সহিত আমরা এই বিষয়েও একমত

যে, দেশে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য কম্যুনিষ্টরাই ছাত্রগণের মধ্যে এই দুর্নীতির উস্কানি দিতেছে। বিচার-সচিবের সূক্ষ্ম বিচার-বোধে ইহাও ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা এই বিষয়ে আশ্বস্ত হইতেছি যে, বিচার-বিভাগ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হাতেই পড়িয়াছে। অতএব আমরা সময় থাকিতে সতর্ক হইতে বলিতেছি।"

এই অনিবার্য মন্তব্য অনুসরণ করেই তাঁর সারপুষ্ট উক্তির নিঃসংশয় উদ্‌ধৃতি। তাই মগজে আজ সঞ্চয় করতেই হবে কর্তব্য-সমুদ্র-মন্থিত দ্বিতীয়ভাগীয় কথা। চাই আজ কালীপ্রসন্ন সিংহের পনের-সেরী ওজনের মহাভারত আর কৃত্তিবাসের আড়াই-সেরী রামায়ণ; চাই গীতা, পৌরাণিক কাহিনী, না-পড়া থাক্‌লেও চতুর্বেদ-না-পঞ্চবেদের উল্লেখ, শতাধিক-না-কত উপনিষদের সহস্রাধিক অপঠিত বাণী, কঠ, কেন, ঐতরেয়ের বৃহৎ অরণ্য, চাই আধুনিক বিবেকানন্দ নতুবা, স্বাধীন দিল্লীর সর্দারী স্বরাষ্ট্রের কাঠামোয় অক্লেশে নিহত জাতির জনক গান্ধীজীর কথামৃত। ভাবছেন, ভাবছেন বিচার-সচিব, দুর্নীতিকে হাড়িকাঠে ফেলে বার বার ধারাল বাক্যের খড়্গগুলোকে নামিয়ে আন্‌ছেন বিচার-সচিব, এ তো শুধু কথামালা গাঁথা নয়, এ যে সুনীতির লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা, সৎ-সঙ্কল্পের স্নায়ুগ্রন্থিগুলোর কাঠিন্য ও শৈথিল্যের হাডুডু খেলা। দুর্নীতির কল্পনায় ঘাম দেখা দিচ্ছে বিচার-সচিবের শরীরে, সপ্তাহে দশটা লাঞ্চ-ডিনার-খাওয়া শরীরে, মোরগ-পুচ্ছের রসমিশ্রণে চঞ্চল রক্তকণিকার আধিক্য ঘটেছে যে শরীরে।

নূতন ক'রে ভাবছেন না কিছুই সদা-মুদিতাক্ষী মীন-সচিব যিনি প্রধান অতিথি হবেন এই পূতকরিণী সভায়। কবে কোন্ কালে সেই যে ভেট্‌কী মাছের নিশ্চিদ্র ও তন্দ্রাতুর সাধনায় তলিয়ে গেছেন, আর কেউ তাঁকে বাইরের আলোকে দৃষ্টিপাত করতে দেখেনি। চোখ বুজে অনায়াসে তিনি সহরে মাছ আমদানীর মণ-সের বলে দিতে পারেন। অনর্গল বলে দিতে পারেন মাছ-খেকো শাক্ত বাঙালীর পাতে ক'টুক্‌রো পড়ছে, ওঁকে কেউ যদি ঝাঁকুনি দিয়ে জিগ্‌গেস করতে পারে। নির্লিপ্ত ভাবে মুখে পানের ঝোল সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে বলে দিতে পারেন মাছের আকাশ-ছোঁয়া উঠতি দর। আর বাজারে মাছ-বেচিয়েদের মজ্জাগত সেরকে বারো-চৌদ্দ ছটাক দেয়ার ধর্ম্মনীতি শুনে মেঘভরা আকাশে একটু রোদের ঝিলিকের মতো হেসে সঙ্গে সঙ্গেই সুষুপ্তিতে তলিয়ে যেতে পারেন, কেন না, মাছ তো সোনা নয়! এই আত্মস্থ সিদ্ধপুরুষই আজ হবেন এ সভার প্রধান অতিথি, নিউ মডেলের নিঃশব্দ চাকায় শুয়ে গড়িয়ে উপস্থিতি দেওয়া ছাড়া বিচার-সচিবের মতো কণ্ঠছেঁড়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়ার সাধ্যই যাঁর নেই, অত ভীষণ ক'রে প্রতিমুহূর্তে জেগে থাকার সশব্দ প্রদর্শনী যাঁর পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য—একেবারে গভীর জলের ভেটকী মাছের মতো যিনি প্রশান্ত।

এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন জনপ্রিয় আবগারী-সচিব, আবগারী বিভাগীয় কোন নিষিদ্ধ বস্তুর স্পর্শ থেকে কংগ্রেসের অহিংস আমল অবধি নিজেকে দূরে রেখে সমাজের

সর্বাত্মক কল্যাণের জন্য যিনি নির্বিশেষে ললনার সাহচর্যকে প্রতিদিন অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য উপলব্ধি করার পথে অকৃতদার জীবনকেই স্বেচ্ছায় অবলম্বন করেছেন; সৃষ্টি রক্ষার প্রয়োজনে সমাজে বিবাহের গাঁটছড়াকে তিনি ভাষণে বা লিখনে কখনও অস্বীকার করেননি, কিন্তু একটি মাত্র ক্ষুদ্র পরিবারের সঙ্কীর্ণ চিন্তাকে তিনি রাষ্ট্রের মতো বৃহত্তম পরিধিতে প্রসারিত করবেন এই সঙ্কল্প নিয়েই তিনি বরাবর নিজেকে বিমুক্ত রেখে এসেছেন। তাঁর বৈঠকখানার এই একটি উদাত্ত বাণীই লেখা আছেঃ 'নাল্পে সুখম, ভূমৈব'। সস্ত্রীক স্থান দিয়েছেন তিনি পুরাতন ভৃত্যকে নিজস্ব অন্দর-মহলেই, নিজের কোন অন্দর নেই বলে। পুরাতন ভৃত্যের নিতান্ত জৈবিক ফ্রয়েডীয় ঈর্ষা ছাড়া জনমতের আদালতে তা অবিকৃত ঔদার্য বলেই স্বীকৃত হয়েছে। আজ সর্বজনস্বীকৃত এই মুক্ত পুরুষই এই অহল্যা উদ্ধারণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন। ভবিষ্যৎ ভারতের অস্ফুট কুঁড়িপ্রায় ছাত্র-সমাজের দুর্নীতিপরায়ণতায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন আবগারী-সচিব।

বক্তাদের তালিকায় আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম আছে যাঁরা কলায়, শিল্পে, সাহিত্যে, গবেষণায় এবং আরও অনেক-অনেক ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। তাঁরাও এসেছেন এবং সরাসরি পুরোহিত, উদ্বোধক, প্রধান অতিথির আশে-পাশে খালি চেয়ারগুলো পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত অধিকার ক'রে নিলেন চারটেয় যে সভা হবার কথা ছিল। স্বাধীন হবার আগে এবং পরে নেতৃবৃন্দ দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন সময়ের ওপর

জোর না দিয়ে। ওঁরা সব যাঁর-যাঁর বক্তব্যের তূণীর কাঁধে ফেলে অদম্য অধৈর্যে কালক্ষেপ করতে লাগলেন। আশঙ্কায় আশঙ্কায় হৃৎপিণ্ডের লাপডাপের নৃত্য তীব্রতর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, পাছে তাঁর তূণীর থেকে চুরি করে কোন মহাবাণ অগ্রাধিকারের সুযোগে কোন বক্তা শ্রোতাদের লক্ষ্য ক'রে মেরে বসেন; তাতে তাঁর কল্পনার তাঁতে-বসানো রঙিন পাড়ের বাক্‌-বস্ত্র সবটাই ফেঁসে যেতে পারে। হাঁটু নাড়ছেন; জোর হাঁটু নাড়ছেন,. সোইং মেসিনের মতো পা নাড়ছেন বিয়াল্লিশ বছরের মিস্‌ বিটপী নান—মহেশতলা বালিকা বিদ্যায়তনের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। উনি আজ বহু প্রযত্নে কথার ফুল তুলে এনেছেন ওঁর ধৃতির টেবিল-ক্লথে, সেই প্যাটার্ণটাই না কেউ আগে-ভাগে লোকের কর্ণপটহে চাক্ষুষ করে তোলে! এই আশঙ্কায় হাঁটু স্পন্দিত হয়ে উঠেছে প্রবলতর।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট অবকাশ দিয়ে চারটের সভা পাংচুয়ালি ঠিক পৌনে পাঁচটায় সুরু হয়ে গেল। ব্রহ্ম-সঙ্গীতের স্তবক থেকে স্বয়ং আচার্য মহেশ দাসের চয়ন-করা গানখানিই প্রৌঢ়া মহিলাগণ তিনটি যুবকের খাদ-গলা পেছনে রেখে অর্গ্যান বাজিয়ে গাইলেন। প্রার্থনা জানালেন আচার্য দাস সেই নিরাকার পিতার কাছে, তাঁর সুনীতির ঝারি থেকে করুণা-কণা ঝাড়তে বল্‌লেন বেণীদের ব্যাকব্রাশী মাথায়-মাথায়। অভ্যর্থনা সমিতির কেদারবাবু ইংরাজীতে যাকে বলে চেয়ারম্যান, শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব তাঁর দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং ভবিষ্যৎ ভারতের অধঃপতনে বেদনাক্লিষ্ট

মুখেই 'করেঙ্গে-ইয়া-মরেঙ্গে' উচ্চারণ করে নির্দ্দিষ্ট আসনে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

যথারীতি সুরু-করা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন আবগারী-সচিব এবং বিশেষ জোর দিয়েই বল্‌লেন, বস্তুত, মানুষের চিত্তে সুনীতির উদ্বোধন করতে পারে নারী এবং এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কোন নারী করলেই শোভন হ'ত। কিন্তু উদ্যোক্তারা যখন আমার কাছে এই আবেদন নিয়ে হাজির হলেন, তখন ছাত্রদের দুর্নীতিতে আমি এতই বিহ্বল ছিলাম যে, নিজের নরত্ব মনে ছিল না। তবু বলব, আপনাদের সকলকার চিত্তে সুনীতির বিকাশ হউক। আমার মনে হয়, মানুষ যদি আপন আপন ক্ষেত্রে কর্তব্য ক'রে যায়, তবে দুর্নীতির অবকাশ থাকে না। আমি জানি, আমার সচিবত্ব নিয়ে সাধারণ ভাবে সকলের মনে এবং বিশেষ করে তপশীলিদের মনে হিংসা আছে, কিন্তু আমি নিরুপায়, কেন না, জনগণ আমাকে নির্বাচন করেছে, আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে এবং জনগণের মানস ক্ষেত্রে আমার আবগারী বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আপনারাও জনগণমন-অধিনায়কের আশীর্বাদে কর্তব্য ক'রে যান। 'বন্দেমাতরম্', 'জয়হিন্দ' 'দিল্লী চলো'র প্রত্যেকটি নৌকোয় যেন পা থাকে আপনাদের।

বাণী পড়া হল অনেকের– রাষ্ট্রপালের, প্রদেশপালের, সেনাপালের, বাণিজ্যপালেরও। বড় বাজারের চোরা-গলিতে বাসুকির ফণা পর্যন্ত সাত তলা বাড়ীর শেকড় নামিয়ে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন যে গোকুলরাম বংশীরাম এমেলে, তিনিও

গ্রীজের সংশ্লেষে প্রস্তুত দু'টিন বনস্পতি আর দু'বস্তা পাথুরে ময়দা পাঠিয়ে অতিথিবর্গকে আপ্যায়িত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। সংবাদ পেয়ে বেচারাম কেনারাম দুই বস্তা বালি কাগজের মতো বালি-চিনি এনে দিয়েছেন অভ্যর্থনা সমিতির হাতে এবং অভ্যর্থনা সমিতির কেদার বাবু ওরফে শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে সবার কাছ থেকে করতালির চাঁদা আদায় করলেন।

তালিকা মতো বক্তার পর বক্তা আদম-ইভের কাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সংগ্রথিত নানা সদ্গাথা উচ্চারণ করে নিজেকে সব বিষয়ে ও সকলকার উর্ধে প্রতিপন্ন করলেন। এই মহা সম্মেলনে অন্তত এটা জানা গেল যে, দেশে গুটিকয়েক সাধু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা নীতি সম্বন্ধে দু'কথা বলার অধিকারী। এই ভাল লোকগুলোকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ক'রে শ্রোতাদের অনেকেই ধন্য হ'য়ে গেল। সরকারী প্রতিষ্ঠানের লোক-নিয়োগে স্বীয় পরিবারের বাইরে যিনি মেধাবী লোক খুঁজে পান না, সেই মাইনাস সিক্স চশমার বোনার্জি সাহেবের কথামৃত গৌড়জন আনন্দে পান ক'রে চরিতার্থ হ'ল।

আহ্বান পেয়ে বিরাট্ নিতম্বকে জুরি গাড়ীর মতো হাঁকিয়ে নিয়ে এলেন মাইক্রোফোনের কাছে বিয়াল্লিশ বছরের মিস্ বিটপী নান। গাঢ় বেগুনী রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ী তের বছরের কিশোরীর মতো নারী অঙ্গের সকল মোড় ঘুরিয়ে কোমরে জড়িয়ে রেখেছেন মহাদেবের সাপের মতো।

একবার মিসেস্ জীবনের পরিক্রমা সত্ত্বেও নূতন ক'রে মিস্ জীবনের গরমে মাথায় কাপড় রাখতে পারেন না কখনও মিস্ বিটপী নান এবং সিঁদুরকে বরাবরই পারার ভয়ে নয়, প্রাগৈতিহাসিক বলে বর্জন করে এসেছেন এবং শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে আমদানী করেছেন ঠোঁটের লালিমা, বিয়াল্লিশ বছরেও যার মায়া কাটানো দুঃসাধ্য। বিয়াল্লিশ বছরের খাঁচায় তের বছরের কিশোরী ছট্‌ফট্ করছে। নিতান্ত বেণীটা দু'দিকে কেউটের মতো দুলিয়ে দেন না বটে, কিন্তু ঠিক কাঁধের সীমা পর্যন্ত ছাঁটা নিস্তৈল কেশদাম স্যাম্পু করতে ভোলেন না এক দিনও; ফিল্টার্ড জলে তিন বার মার্গো ঘসে স্নান করার পর ভবিষ্যতে অম্লপ্রধান স্বেদস্রাবী রোমরন্ধ্রে অসংখ্য ট্যালকাম কণিকার বাঁধ বসাতে ভুল হয় না এক দিনও। সেই বিটপী নান। বাঁ হাতে স্যাম্পু-করা চুলের একমুঠো কানের পেছনে ঠেলে মাইক্রোফোনের ডাণ্ডাটা ধরলেন নিরলঙ্কার মেদবর্তুল দক্ষিণ পাণিতে বিয়াল্লিশ বছরের মিস্ বিটপী নান।

বল্‌লেন, প্রায় পাঁচ ইঞ্চি ঠোঁট জোড়া ব্যাদান ক'রে বল্‌লেন, চমৎকার দু'টো উদ্‌ধৃতি শোনালেন সেক্ষপীয়ার ও বাইরণ থেকে এবং বল্‌লেন, ইংরিজীতেই বল্‌লেন, বেশ জোর দিলেন বলার ওপর, কেন না তিনি বল্‌তেই এসেছেন, আর যারা শুন্‌তে এসেছে, তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুন্‌ল বিশুদ্ধ ইংরিজী, বক্তব্যের চাইতেও যা মনোরম ও মুখ্য। লক্ষ টাকার বেহাত-গুজব-নিন্দিত সদ্য মাতৃদায়ে নেড়া-মুণ্ড কন্‌ট্রোলী বস্ত্র-বণ্টনের ঊর্ধ্বতম বঙ্গ-চাই নবনীতশেখরের

বিলম্বিত প্রবেশে উদ্যোক্তাদের অতি-চাঞ্চল্যও বিরতি ঘটাতে পারেনি মিস্ বিটপী নানের বক্তৃতায়। দুর্নীতি দমনে আন্তরিক একনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'য়ে থাক্লেন মিস্-মিসেস্-মিস্ বিটপী নান।

পুরী-তটে ফাঁপানো-ফোলানো অবিরাম ঢেউয়ের মতো বক্তাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘট্তে লাগল। আছে, অনেকের আছে, অনেকের অনেক কথা বলার আছে, ভালো ভালো কথা, আমারও আছে, আমারও আছে বক্তব্য, মৌন থেকে অসাধুতায় সম্মতি দেয়া অসম্ভব। ঢেউয়ের পর ঢেউ, তারও পরে ঢেউ।

অকস্মাৎ যেন ক্লান্তির নিস্তরঙ্গ যতি। ঐ একটু ছেদ বিদীর্ণ ক'রে সভার মাঝখানে শীর্ণকায় এক ব্যক্তি টন্‌সিলে-বিকৃত কণ্ঠধ্বনি বিনা মাইক্রোফোনেই সবার কানে আঘাত করল। ঘাড় বেঁকিয়ে কিছুক্ষণও শোনা যায় না ব'লে 'আপনি সামনে আসুন', 'সামনে আসুন' সমান্তরাল প্রতিধ্বনি উঠতেই লোকটি বাতাসে ভর করে যখন মঞ্চে এসে উঠ্‌ল, তখন পূর্ববর্তী বক্তাদের বেশ-পারিপাট্যের সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য ওপরকার আলোর ঝাড়ের চাইতেও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সেদিকে লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবার আগেই খন্ খন্ শব্দে কানে এল :

"সরকারের বড় চাকুরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক, অধ্যাপক, এমন কি ছাত্রদের পক্ষ থেকেও আপনারা দুর্নীতির কথা শুনলেন। আশা ছিল, অভিভাবকের পক্ষ

থেকেও কেউ বল্‌বেন। স্বীকার করি, আমার ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা এই মাত্র যাদের নিন্দা করলেন, তাদের দলে আমাকেও ফেল্‌তে পারেন, কেন না, আমি ধৈর্যহারা হ'য়ে গেছি। সত্যি, পরীক্ষায় নকল করা অন্যায় নয়, একথা বলার সাহস আমার নেই। আমার শরীর দেখে কিছু মনে করবেন না, আমার সাত ছেলে ছিল। তবু আমি নরোত্তম বিবেকানন্দের বাণী আমার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছি। ভক্তি ছিল, ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা মুখস্থ ছিল, আশা করি, তবু ছেলেপিলে কি ক'রে হ'ল, তা আমাকে ভেঙে বল্‌তে অনুরোধ করবেন না। শ্রীভগবানের দয়ায় সৃষ্টির কর্তব্য কর্ম আমি করেছি, তার ফল ফলেছে, একটু বেশী মাত্রায়ই ফলেছে আপনারা বল্‌তে পারেন, কিন্তু আপনারা জানেন, জমি উর্বরা থাক্‌লে চাষীর তাতে হাত নেই······"

সভাপতি সভার অস্বোয়াস্তির বর্শা-ফলক দিয়ে অভিভাবক-বক্তাকে খুঁচিয়ে দিতে সে হাতজোড় করে বল্‌ল—

"হ্যাঁ, দুর্নীতির কথাই বল্‌ছি। এ কথা আমি বুঝেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণতা মারাত্মক নয়, মারাত্মক দুর্নীতি-পরায়ণতার ঘটনা প্রকাশ করা। আমি সে চেষ্টাও করব না। আমি শুধু দুর্নীতির কথাই বলছি। ১৯৩৯ সালে বড় ছেলেটা এ আর পিতে ঢুকে পড়্‌ল। দ্বিতীয় ছেলেটা রাতে হোম-গার্ডের লাঠি নিয়ে ঘুরতে লাগ্‌ল, ১৯৪১ সালে অকস্মাৎ

এক দিন তৃতীয় ছেলেটা বাড়ীতে জনযুদ্ধের হুঙ্কার দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, আমাকেই বলে গেল, সে তার পিতৃভূমি রুশিয়ায় যাবে। ১৯৪২ সালের ঘূর্ণিপাকে আমার পেণ্টু, মানে, চার নম্বর ছেলেটা তলিয়ে গেল। এল ১৯৪৩ সাল! একে তো কলকাতায় কোন সমাজ, বা প্রতিবেশী নেই, যাও বা একটু দেখা হ'লে শুষ্ক হাসির ইয়ে ছিল, তাও এই মন্বন্তরে ছানা-কাটা হ'য়ে গেল। লাগ্‌ল বাড়ীতে চাল-ডাল-তেল-নুণ-লক্‌ড়ি, মানে কয়লা সংগ্রহের ধূম। বাহাদুর ছেলে আমার বড়টা আর মেজটা—এ আর পি আর হোম-গার্ড। আমি বলেছি, দুর্নীতি-পরায়ণতার কাহিনী দুর্নীতিপরায়ণতার চাইতেও বেশী মারাত্মক, তাই বড়-মেজর বাহাদুরির কথাই বল্‌লাম, কাহিনী বল্‌লাম না। যা হোক্, পাড়া-পড়শীকে নলচে আড়াল দিয়ে দিন কাট্‌ছে আমাদের। আমি নিজে কিন্তু নীতির ধ্বজা ধরে বসে আছি, কাপড়ের দোকানে ৩৫৲ টাকায় কাজ করি। যত ষড়যন্ত্র চলছে গিন্নীকে কেন্দ্র ক'রে! একটা-দুটো করে করে ওষুধের পাহাড় ক'রে ফেল্‌ল ৫ নং ছেলেটা। অদ্ভুত মাথা! বিক্রী করে না, বলে সবুর করো। দাম চড়বে। বাস্তবিক, ওর ভবিষ্যৎ-বাণী ফল্‌ল। ছ'নম্বর ছেলেটা যে কি ক'রে এত হাবা-গোবা হ'ল, জানি নে। ম্যাট্রিক আর কিছুতেই পাশ করতে পারে না। ইচ্ছে ছিল, ওটা পাশ করলেই কোন কনট্রোল-মনট্রোলে ঢুকিয়ে দেব। জিনিসের দামের সঙ্গে তাল রেখে আমার আয় বাড়ছে না, ক্রমেই

নীচে তলিয়ে পড়্ছে। লোকে বলে, যুদ্ধ সব শুষে খাচ্ছে জিনিস-পত্তর। ভরসা হ'ল, যুদ্ধ থাম্লে দাম পড়বে। কিন্তু, ভগবানকে ধন্যবাদ তো দেবই নইলে অধর্ম হবে, আমার বড়-মেজকেও ধন্যবাদ, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে যে ৩৫ লক্ষ লোক মারা গেল, আমরা সে তালিকায় পড়িনি। তবে হ্যাঁ, অভাব। ছ'নম্বরের বোকা ছেলেটাকে ডেকে বল্লাম, এবার যদি পাশ করতে না পার, বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেব! বসিয়ে পিণ্ডি গেলানোর জমিদারী আমার নেই। সে জবাব দিল না, মাথায় ক'রে পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কেনা, নয় তো ধার-করা বইয়ের গন্ধমাদন নিয়ে এল, বল্লে তোমাদের কালে ছিল সাতশ' আমাদের বেলা ন'শ'। বলে, রাতে নিষ্প্রদীপ, পড়ব কখন? বল্লাম, দিনের বেলা কি চোখের মাথা খাও? বল্লে, চাল-তেল-নুণ-কয়লার দোকানে কিউ দিয়ে দাঁড়াবে কে? বড়দা এ আর পি, মেজদা রাতে জাগে দিনে ঘুমোয়, সেজদা জাপান রুখছে···বল্লাম, তর্ক চাই না, পাশ চাই।"

শ্রোতৃবৃন্দ ও মঞ্চোপরি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রায় সমস্বরে বললেন, সংক্ষেপ করুন, সংক্ষেপ···

বক্তা বলল, "ব্যাপারটা সত্যই সংক্ষেপে ঘটে গেল। বল্তে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে মশাই, আপনারা সুধী জন, সুনীতিই আপনাদের ইয়ে, মশাই, ছেলেটা নকল করতে গিয়ে ধরা পড়্ল। কিন্তু বাড়ী ফিরল না। খবর যখন পেলাম, তখন সে বোটানিকাল গার্ডেনে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্ছে—

নিস্পন্দ এবং সকল পরীক্ষা ও বকা-ঝকার অতীত। তার পর আমার পেছনে লাগল পুলিশ। নিজের ছেলেও গেল, গিন্নীর হার-ছড়াটাও গেল।

আমাদের ভাড়াটে-বাড়ীর সুমুখে খালি জায়গায় পাড়ার সব চাইতে বখাটে ছেলে মন্টু যুদ্ধের ঠিকাদারির যে ইমারত তোলার আয়োজন করছে আমার ওষুধ-বেচা ছেলেটা সেদিকে তাকিয়ে আমায় দুর্লভ দু'টিন প্যারাফিন দেখিয়ে ইঙ্গিতে জানায়, ভেবো না, বাবা। প্যারাফিনের পিছল পথে এক দিন ধরাও পড়ে গেল। এর পরেও এক দিন, কি বলব, আপনারা সজ্জন, ভোর বেলা একটা কিছু পড়া বা ফেলার শব্দে জেগে উঠে যা দেখলাম তাতে আমার সুনীতি তুঙ্গ হয়ে উঠল। কোন এক কয়লার গাড়ীর পেছন থেকে ছোট ছেলেটা এক চাকা সরিয়ে এনে মাতৃভাণ্ডারে জমা দিচ্ছে। বাংলার বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে যাব, বাঘিনী মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, খবরদার, আমার পা জ্বালিয়ে তোমার পিণ্ডি রাঁধব, ভেবেছ?"......

সভাপতি অত্যন্ত বিরক্তিভরে বললেন, কি করছেন মশাই, আসল বক্তব্য কই?...

বক্তা বলল, "মাপ করবেন, শেষ হয়েছে, আর একটি-দু'টি কথা বাকী।

পরিণতিতে বড়টা এ আর পি আর মেজটা ওয়াকাই থেকে সঙ্গিনী নিয়ে এল। কম্যুনিষ্ট ছোঁড়াটা বিয়ে-সাদি করল না, একটি লাল মেয়ে নিয়ে রোজ পোষ্টার লেখে।

১৯৪২ সালের ছেলেটা ১৯৪৫ সালে জয় হিন্দ করে হাসপাতালে মারা গেল। তার পর লাগল জিন্নার সাঙ্গোপাঙ্গদের লড়কে লেঙ্গে। কিন্তু বাহাদুর জাত ওরা। ওরা নিল লড়কে বাংলা। তার পর লড়াই সুরু হ'ল কলকাতার বাড়ীওলাদের। বাস্তুহারার সমাগমে কলকাতা গম্‌গম্‌, শেয়ালদ থেকে সহরের গ্যারাজ, কয়লার ঘুপচি, ফুটপাথ মানুষের বাসস্থান হ'ল। বাড়ীওলারা পুরোনো ভাড়াটেদের যে কোন অজুহাতে তাড়িয়ে স্থান-বুভুক্ষু বাস্তুহারাদের গলা কাট্‌তে লাগল প্রকাশ্যে। বহু পুরোনো বোমা-খাওয়া ভাড়াটে আমার মাথার ওপর গৃহচ্যুতির খাঁড়া ঝুল্‌তে লাগল। পশ্চিমবঙ্গের এক ফসলী জমির ওপর তৈরী স্কুল-কলেজগুলিতে তিন ফসলী ফলতে লাগল—সকাল থেকে রাত অবধি ছাত্রের চলাচলে সিঁড়ি আর ঠাণ্ডা হয় না। হ্যাঁ, ছোট ছেলেটা সত্যই চালাক, চমৎকার রং বদ্‌লাতে পারে, কি রকম আঁচ ক'রে আগেই কংগ্রেসে ঢুকেছিল, কাকে ধরে লাইসেন্স-পারমিটও পেল, আপনারা শুনে সুখী হবেন, আমরা নিজেরাই একটি কাপড়ের দোকান করেছি, 'রঘুপতি রাজারাম বস্ত্রালয়', ১০ নং নকুড় ঠাকুর লেন। আপনারাই বলুন, ছেলেটার পড়া যখন হ'ল না, তখন ব্যবসায়ী-সাফল্যের চাইতে বড় সুনীতি আর কি আছে?"...

একটা লোকও হাততালি দিল না। একটা ক্যান্‌ভাসারের বক্তৃতা এতক্ষণ তারা কি ক'রে শুন্‌ল, তাই ভেবে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। পট্‌-পট্‌ ক'রে বারোটা জিঞ্জারের বোতল খুল্‌লেন

অনুষ্ঠানের পুরোহিত মশাই—রঙিন, ঝাঁঝাঁলো, ফেনিল; ঠিক মুখ দিয়ে যা সম্ভব নয়, তা কান দিয়ে গিয়ে সকলকার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল; যে গণতন্ত্রের খাতিরে তিনি লোকটাকে বল্‌তে দিয়েছিলেন, সে গণতন্ত্রকে অভিসম্পাত করলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বলে শাসালেন যে, তাঁরা শীগ্‌গিরই খোলা ময়দানে সরকারী সরবরাহ-সচিবকে পুরোহিত, সহরের কোতোয়াল-শ্রেষ্ঠকে প্রধান অতিথি এবং পৌর-প্রতিষ্ঠানের কোন প্রাক্তন মেয়রকে প্রধান বক্তা ক'রে দুর্নীতিদমন মহাসম্মেলন করবেন! অন্যথা নির্দোষ সমাজ-দেহে এই যে ছাত্রদের নকল করার নালী-ঘা হয়েছে, এর অস্ত্রোপচার করতেই হবে।

এবার শ্রোতৃবৃন্দের চাপা আবেগ দ্বিগুণ জোরে যার-যার হাতে এসে লাগল, আর একসঙ্গে বহু বাজ পড়ার শব্দ।

সভান্তে আবগারী-সচিবের সরকারী গাড়ীটার কাছে মিস্ বিটপী নান ওঁর ভ্যানিটি ব্যাগে কি খুঁজছেন যেন। কৃপাময় সচিবের অনিবার্য দৃষ্টিপাত হ'ল এই বিব্রতার ওপর। গলা বাড়িয়ে জিগ্‌গেস করলেন, বাড়ী যাবেন তো? বলতেই অত-বড় গাড়ীর চওড়া দরজার হাতল ধ'রে মনোরম সুরে বল্‌লেন বিটপী নান: না, আপনার আবার ট্রাবল হবে; ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না করেই অত-বড় গাড়ীর অতখানি খোলা দরজা দিয়ে গলে গেলেন মিস-মিসেস-মিস নান। নরম গদীতে নেচে বসতেই স্প্রিংয়ের দোলায় আবগারী-সচিব বেগুনে শাড়ীর গন্ধ পেলেন।

দুর্নীতির সভানুষ্ঠান ক্রমশ দূরে—অতি দূরে ফেলে অত-বড় গাড়ীখানা কলকাতার বুকে ৩০ মাইল বেগে ছুট্‌ল।

১৩৫৬, শারদীয়া

সন্তোষকুমার

সেদিন সন্তোষকুমারের সঙ্গে দেখা। বৌবাজারের মোড়ে লোহার শীক্‌টা নিয়ে ট্রামলাইনের পয়েণ্ট খুঁচিয়ে দিচ্ছে। না হয়তো, ট্রামপোষ্টের সঙ্গে লাগানো তারের হাতলটা ধরে টানতে গিয়ে আরামে ঠেস দিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমার সঙ্গে দেখা। খাকি পোষাক গায় দিয়ে, কালো টুপিটাকে ওরই মধ্যে একটু ট্যার্‌চা ছন্দে বসিয়ে দিয়েছে, যেন, ভেতরের স্যালুনে-ছাঁটা কেশবিন্যাস একেবারে লোক-চক্ষুর অগোচরে না যায়।

চেনা যায় না। ধুতি পাঞ্জাবীর খাঁচায়ই ওর চেহারা দেখতে অভ্যস্ত। সেই দেহটাকেই খাকি কোট-প্যাণ্ট আর কোম্পানীর জুতোয় ঢুকিয়ে দিলে চেনার চৌহদ্দি ছাপিয়ে যায় বৈকি।

তবু চিনলাম। ট্রামের অপেক্ষায় ঐ ট্রামপোষ্টটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম।

এই যে সন্তোষকুমার,······

পরিচিত 'জন' দেখে প্রথমটায় সে যেন হক্‌চকিয়ে উঠল, মুহূর্তের চেতনায় সম্ভবত ঐ বাঁদুরে পোষাকটা আর ছোট কাজটার উদ্দেশে অভিশাপ জানালো, সম্ভবত, তার পরেই এক মুখ হাসি নিয়ে বলল, এই যে······

সন্তোষকুমার পোষ্টের তারটা ছেড়ে দিয়ে লোহার শীক্‌টা নিতম্বে ঠেকিয়ে দাঁড়ালো। বল্‌লে, বহু দেশদেশান্তরে ঘুরলাম হে, রকমারি চাকরী করলাম, চাকরী বড়োই হোক্

আর ছোটোই হোক, এক জিনিস। গোয়ালিয়রে দেড়শ টাকার চাকরী এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলাম, তোফা ছিলাম, কিছুই করতে হত না, একদিন একটু কথার এদিক ওদিক, ব্যস্, নাঃ বেশ আছি, বেশ আছি······

ঘটং ঘটং ঘটং ঘটং······পর পর কয়েকটা ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে। পয়েণ্ট খুঁচিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সন্তোষকুমারের যেন গ্রাহ্যই নেই।

বেশ আছি, বেশ আছি, প্রয়োজনও কম, বিয়ে থাওয়া তো করিনি; আর চাকরীই যদি করতে হয় তবে ছোটো চাকরীই ভাল, ঝামেলা কম; তা ছাড়া কি, এই ধরনা শীক নিয়ে পয়েণ্ট খুঁচিয়ে দেয়া, দাঁড়াও, এক সেকেণ্ড,······

ততক্ষণে তুইদিকে অনেক কটা ট্রামই দাঁড়িয়ে গেছে। সন্তোষকুমারের যেন কোন তাড়া নেই; ধীরে সে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামল, পয়েণ্টের কাছে গিয়ে লোহার শীক্‌টা ঢুকিয়ে দিল, একটা খটাৎ করে শব্দ হল, তারপর তেমনি ধীরে সন্তোষকুমার আমার কাছে ফিরে এল।

অথচ, সে বলতে লাগল, কাজের ইম্‌পর্ট্যান্সটা তো চাক্ষুষ দেখলে। এক লহমায় একটা বিড়ি ধরাবার উপায় নেই। তোমায় বলতে কি, এর মধ্যে বেশ একটা রোম্যান্স বোধ করি (ইংরেজী যে একেবারে ভোলেনি সন্তোষকুমার এইটেও জানাতে চায় বুঝি), অদ্ভুত একটা ফিলিং, কড়া-রোদে যখন ট্রাম বাস আর লোক চলাচল করে তখন এইখানে দাঁড়িয়ে বুঝি এই গতিশীল পৃথিবীকে আমি এক মুহূর্তে

দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, ট্রামের পর ট্রাম দাঁড়িয়ে যাবে এখান থেকে ওয়েলিংটন অবধি, শুধু আমার একটা পয়েন্টের খোঁচার অপেক্ষায়। বেশ আছি, মাগ ছেলেপুলে নেই, রাতে মাথা গোঁজার একটা জায়গা করেছি, অফ্‌ডেতে এই 'রূপম'-এই ঢুকে পড়ি হাইয়েষ্ট ক্লাশ টিকিট নিয়ে, আর নিতান্ত দৈহিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়তো ঐ······বুঝলে ভায়া ?

অহেতুক হেঁ হেঁ করে হেসে বললাম, চলি ভাই, অনেকদিন পর দেখে বড় সুখী হলাম, আর ভালই যখন আছ—

কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ভালই আছি, ভালই আছি·····

এই আত্মতুষ্টিতে আর বাধা দিতে ইচ্ছা করল না, একটা নিউমডেলের ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে পড়লাম। একটা বসবার জায়গাও পাওয়া গেল; খুব কায়দায় একটা দেশলাইর কাঠি ধরিয়ে বিড়ির মাথায় লাগাবার পর ফস্ করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পাশের ভদ্রলোক কোন এক শ্রোতার উদ্দেশে বললেন, পারতে আমি কখখনো ফার্ষ্ট ক্লাশে যাই না, কেন যাব, আরে ট্রাম তো একটাই, যাবে তো এক জায়গায়ই, ফার্ষ্ট ক্লাশ আর সেকেণ্ড ক্লাশের মধ্যে একগজ পার্থক্য, আরে রেখে দিন গদী, সেকেণ্ড ক্লাশে ছারপোকা থাকবে এতো জেনেই ওঠা, থাকনা দুটো ছারপোকা, হেঃ বলে কতটুকুই বা যাওয়া, কোঁচাটা একটু ছড়িয়ে নতুবা সঙ্গের বইখানা চেপে বসলেই ল্যাঠা চুকে যায়। একটা পয়সাই বা বেশী দেব কেন, বিদেশী কোম্পানীকে ?

ট্রামারোহী এই সন্তোষকুমারের দিকে একবার ভাল করে তাকালাম। সংসার সমরাঙ্গনে বেশ দৃঢ়পণেই যুদ্ধ করছেন ; লড়াইয়ের ছাপ সর্বাঙ্গে, বয়স কত, অনুমান করা দুঃসাধ্য……

ছা-পোষা মানুষ, মশাই, একটা পয়সাই কি কম, আধভাগা লঙ্কা হয়ে যায় মশাই, তাই কোত্থেকে আসে ? এই যে যারা ফার্ষ্ট ক্লাশে যাচ্ছে তাদের ক'জন উপার্জনের মহিমা বোঝে ? ওতে আছে কারা ? কোম্পানীর দেয়া মান্থলী নিয়ে দারোয়ান, পিয়ন, ক্যানভাসার, দালাল, না হয়তো মনিঅর্ডারের দৌলতে ধনবান ছাত্র, অবলা নারী, দেউলে জমিদার বা হঠাৎ-বাবু অথবা সিনেমাগামী পার্টি। উপার্জনের কামড় যারা জানে তারা জানে একটা ফুটো পয়সার ইকনমি। এ বিষয়ে আমি খুব সুখী মশাই, কাপড় চোপড় নিজেরাই কেচে নি, চমৎকার নীল দিতে পারেন আমার স্ত্রী, বাটী গরম করে ইস্ত্রী যা করবেন, মানে, কি বলব, ছোঃ ষ্টীম লণ্ড্রী…তরিতরকারীর খোসা না ফেলে চচ্চরি যা করেন, ও মশাই, না খেলে বুঝবেন না……

এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ জায়গার অপেক্ষায় থেকেও জায়গা না পেয়ে লোহার রড্ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, একটা জায়গা হতেই বললাম, বসুন। তিনি স্মিতহাস্যে বললেন, না, বেশ আছি। বসলেই তো মশাই, রক্তমোক্ষণ, ছারপোকার জ্বালায় অনবরত ভীষ্মের শরশয্যা বোধ না করে বকের মতো খাড়া পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ। তা ছাড়া একটু ফাঁকাও বোধ করছি। বেশ আছি।……

বসে গল্প করে বেশ কাটল যাই বলুন, ইকনমিষ্ট সন্তোষকুমার উঠতে উঠতে বললেন, এই ফার্ষ্ট ক্লাশে গিয়ে এমন আর কি রাজ্যলাভ হত?

তিনি নেমে গেলেন। তাঁর শ্রোতা অকস্মাৎ আমাকে লক্ষ্য করেই বলে উঠলেন, সন্তোষ, আসলে মনের সন্তোষই বড় কথা, মনে যদি ঐ জিনিসটি না থাকে মশাই, তবে সিংহাসনও কাঁটার মনে হয়, আর মনে সুখ থাক্‌লে বনও স্বর্গ। আর ও জিনিসটি জানেন, মশাই, সব জায়গায় হাজির হবে। কারও মনগোমর ক'রে থাকার জো নেই। যে যে-অবস্থায়ই থাক্, সুখে থাকার একটা যুক্তি সে বের কর্‌বেই। সত্যি, আমিও ভাবি, সংসারে এত রকমের ভালমন্দ অবস্থা, ছোট বড় লক্ষ রকমের অবস্থা মানুষের, নানারকম বিপরীত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেও মানুষ বাঁচে কি ক'রে? বিরাট্ এয়ার কন্‌ডিসণ্ড প্রাসাদের উঁচু কোঠায় রেডিও খুলে যারা খানা খাচ্ছে তাদেরই বেয়ারার যখন এঁদো বস্তিতে হাড়িয়া খেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে তখন সে কি পার্থক্যটা বোঝে না? বোঝে, কিন্তু এই বোঝাই যদি স্থায়ী হ'ত, মানে, দিনরাত মগজে যদি উপরওয়ালা সুখী আমি অসুখী এইটাই জেগে থাক্‌ত তবে তার সাধ্য ছিল সে একমুহূর্তও বাঁচে? পাগল হ'য়ে একটা কুকাণ্ড ক'রে নির্ঘাৎ মারা যেত। মারা যে যায় না, তার কারণ, সে ওরই ভেতরে একটা আত্মতুষ্টির দর্শন খাড়া ক'রে ফেলে। হাড়িয়া খেয়ে সে স্ত্রীকে গালমন্দ ক'রে বলে, জানিস, আমার সাহেব পর্যন্ত আমাকে সামলে

কথা কয়, আমাকে ছাড়া খানা হয় না, আমি না ধরলে জামা খোলা হয় না, সেদিন জুতো পালিশের জন্য আমার পিঠ্ চাপড়ে দিল, হে হে, আরে আমি নইলে সায়েব অচল, আর তুই কিনা··· ······এই, এই দর্শন। আচ্ছা, চলি, ব'লে ভদ্রলোক মোক্ষম কথাটি ব'লে নেমে গেলেন। তাঁর আচরণে একথাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল, মশাই, কথার সার বুঝে নিয়েছি ; সবকথার শেষ কথা, চরম কথা, যা ব'লে গেলাম, এর পরে আর কাউকে বল্‌তে হবে না। সব বুঝে বসে আছি।

আমিও নাম্‌লাম। একটা বিরাট্ প্রাসাদেই যাব। ইন্সিওরেন্স কোম্পানী। কয়েকটা 'কেস্' পেয়েছি, দিতে যাব। সত্যি, এতবড় অট্টালিকা, এতো কেবল আমাদের মতো এজেণ্ট আর অর্গানাইজারদের জন্য। এই বাড়ীর প্রত্যেকটা ইটের স্তর আমাদের ·····হ্যাঁ, এ বাড়ীর মূল স্রষ্টা আমরা—আমি। গেট্‌ম্যান কি তার গুরুত্ব বুঝতে পার্‌বে--ঐ লিফ্‌টম্যান ? ফস্ করে পানের দোকানটায় দাঁড়ালাম, আয়নার দিকে তাকিয়ে পানওয়ালাকে বল্‌লাম, একটা ক্যাপ্‌স্টান, আয়নায় নিজের চেহারা দেখলাম, মন্দ নয় চেহারাটা, সুন্দর, নাক চোখ একরকম সায়েবী সায়েবী বলতে হবে, স্যুট পরলে কেমন মানাবে ? পাঞ্জাবী ধুতিতেও বেশ মানিয়েছে। চেহারাটা ইম্‌পোজিং কি বলেন, নিজেকেই জিগ্‌গেস করলাম, নিশ্চয়ই, নিজেই জবাব দিলাম। পানওয়ালা সিগারেটটা এগিয়ে ধরেছে। ওকি একটুও বুঝতে পারেনি আমার পজিসন্, ওকি তাকিয়ে আছে ?

সিগারেটটা নারকোলদড়ির জ্বলন্ত ডগায়ই ধরিয়ে নিলাম, ধোঁয়া ছাড়তেই মনটা কেমন হাল্কা হ'য়ে গেল। কদম কদম বাড়িয়ে গিয়ে বেশ অভ্যস্ত আল্‌তো হাতে, যেন এ অধিকার আমার বংশগত, আমি জন্মাবধি একাজ ক'রে আসছি, কত সহজ আমার কাছে, লিফ্‌টের বোতামটা টিপে দিলাম। একটা বোতাম টেপার অপেক্ষা, লিফ্‌ট্‌ নেমে এল, ঘ্যাট্‌ ক'রে থামতেই হুট্‌ ক'রে ঢুকে পড়লাম, দাঁড়ালাম কি, যেন হাওয়ায় উড়ছি। 'তেতলা', কাউকে উদ্দেশ না করেই উচ্চারণ করলাম।

লিফ্‌টম্যান গম্ভীর। কোনদিকে না চেয়ে কোলাপ্সিবল বেড়া তুটো ছড়াৎ ছড়াৎ ক'রে আট্‌কে দিল ; সুইচ্‌টা অন্‌ ক'রে দিতেই লিফট উঠতে লাগল ; কারও মুখে কোন সাড়া নেই ; কেবল লিফট ওঠার একটা একটানা মৃত্যু 'কু' শব্দ। ঘ্যাট্‌ ক'রে থামল একজায়গায় ; লিফটম্যান ছড়াৎ ছড়াৎ ক'রে তুটো কোলাপ্সিবল বেড়া খুলে দিল ; বললওনা একবার, যান। নিপুণ ছিম্‌ছাম হাত, নিখুঁত একেবারে। আমিও কিছু বললাম না, গ্যাট্‌ গ্যাট্‌ ক'রে সোজা বেরিয়ে গেলাম। পেছনে লিফটম্যানের ছড়াৎ শব্দ, আবার চলল কোথাও। ও জানে ওর গুরুত্ব, বিত্যুৎগতিতে ওর কাজ ; লোকের তর্‌ সয় না। ও-ও তড়িৎবেগে নাম্‌ছে উঠছে, তু'তলা চারতলা। ও জানে, ওকে ছাড়া, এই সব ব্যস্তবাগীশদের উপায়ান্তর নেই।

এই তুনিয়ায় আত্মতৃপ্তি বেশী, না, আত্মহত্যা বেশী?

জীবনের বৈরাগ্য বেশী, না, আসক্তি বেশী? এই মাটির চাকাটা যে পাই পাই করে ঘুরছে, এ কার ওপর ?......

...খেয়ে না খেয়ে লেখাটা করেছেন, চমৎকার, ছাপাকে হার মানিয়ে দেয়।......

লেজার বাবু সন্তোষকুমারের সর্বাঙ্গ ঝলকে উঠল, একরাশ রক্ত হার্ট থেকে গল গল গতিতে সমস্ত স্নায়ুতে ছুটোছুটি করে মুখে এসে ছাপিয়ে পড়ল, তার পরই একটু ফাঁক করা মুখে দাঁতগুলো ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠল, মুক্তোর মতো অক্ষরগুলোর দিকে বেড়ালের মতো মাথাটা একবার একাৎ একবার ওকাৎ করে তাকিয়ে বললেন, যান, আপনি বড় বাড়াতে পারেন।

না, সত্যি......বুঝতে দেরী হ'ল না, তিনি আবার আমার প্রশংসার পুনরাবৃত্তি চান। লেখাটা যে ভাল তিনি তা জানেন। সত্যি লেখাটাও ভাল। প্রশংসার পর সন্তোষ কুমার আরও টেনে টেনে লেখেন। বোঝেন, লেখাটা ভাল। সুস্বাদু একটা খাবার খেলে মুখ যেমন লালে ঝোলে ভরে যায় তেম্‌নি একটা তৃপ্তি সন্তোষকুমারের—আত্মতৃপ্তি। ঠিক এই সময়টা কি মনে পড়ে তাঁর মাইনের কথা, সংসারে হাহাকারের কথা, দুধের অভাবে রিকেট ছেলেমেয়ের কথা? পড়ে না। আত্মতৃপ্তির দোলা তাঁর সর্বাঙ্গে—চমৎকার, চমৎকার! যুদ্ধের আগে কেনা সোয়া বারোটাকার জুনিয়ার পার্কারটা আস্তে লেজারের পাশে রেখে দিয়ে ব্যাক ব্রাশে সাঁটা মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে একবার নিষ্কলঙ্ক খাতাটা দেখে নিলেন। সমস্ত খাতাটাই এমন, মুক্তোয়

পরিপূর্ণ, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, নিষ্কলঙ্ক নিখুঁত। তাকের ওপর সাজানো এত বছরকার খাতাগুলো। নিপুণতা ক্রমেই বাড়ছে। হ্যাঁ ছিল, এমন দিন, যখন হাত কাঁপত, আজ তা নিষ্কম্প, দৃঢ় নিশ্চিত। এই লেখা দেখেই তো বড়কর্তা তাঁর চাক্‌রীর সুপারিশ কর্‌লেন। সন্তোষকুমারের স্ত্রী বল্লেন, তোমার চিঠি পেলে কি লিখেছ তা দেখবার আগে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি চিঠিটার দিকে, এমন লেখা কি করে কর্‌লে, হ্যাঁগা। মেজ মেয়ে মীনেটার হয়তো এম্‌নি লেখা হবে, তাঁরই হাতের লেখায় হাত ঘুরোয়।···

জীবনদ্বন্দ্বে বাঁচবার পুরো এক ডোজ আত্মতৃপ্তির টনিক খেয়ে লেজার কীপার সন্তোষকুমার গা ঝাড়া দিলেন, কলম এসে পড়ল আঙুলের চাপে।

নীচে এসে রিক্সা কর্‌লাম। না হোক্ প্রিয় রোল্‌স রয়েস, একা একটা হাঁটুর ওপর আর এক পায়ের য়্যাঙ্কল তুলে খানিকটা কাণ্যি মেরে বস্‌লাম। রাজা রাজা—কেমন নৃত্যের ছন্দে চল্‌ছে, কেমন ঠুং ঠাং সঙ্গীত, দিব্যি আরামে খোলা হাওয়ায় চলন, সিগারেটের ধোঁয়াগুলো স্পাইরাল করে ছাড়তে লাগ্‌লাম। “বাঁয়া”, হিন্দীতে চালককে নির্দেশ দিলাম, রিক্সা বাঁ দিকে মোড় ফির্‌ল। “রোকো”—গাড়ীকে রুখতে বল্‌লাম—আমার গাড়ী। হাতের সিগারেটটা টোকা মেরে দূরে ফেলে দিয়ে নাম্‌লাম।

রিক্সাওয়ালা রিক্সা নামিয়েই হাতের গামছা ঘুরোতে ঘুরোতে বলল, “মারে পসেনা” ;—আমার দেয়া পয়সা

নিতে নিতে বলল, দেখিয়ে, এই-সা জলদি কৌন আয়গা ?

সত্যি, মজবুত তার দেহ, ঘোড়ার মতো ছুটে সে এসেছে, এত তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছোবার আত্মপ্রসাদ তার হ'তেই পারে। পঙ্খীরাজ ; আমিও খুসী হয়ে একটা আনি বেশী দিয়ে দিলাম। রিক্সাওয়ালাও আর কোন কথা খরচ না করে রিক্সাসহ হেলতে দুলতে চলতে লাগ্‌ল।

বাঁচে কি করে ? কি নেশায় মাতাল হয়ে এরা বাঁচে ? মানুষ আকাশ চিরে ঝড়ের বেগে হিল্লী থেকে দিল্লী যাচ্ছে, নীচে, সমাজের অনেক নীচে এই মজবুত লোকটা অলি-গলিতে ছুটোছুটি করে বুক ছিঁড়ে ফেলছে। কিন্তু আমায় যখন সে টেনে নিয়ে এল, তখন কি তার একথা মনে ছিল, গরম পীচের পথে, বর্ষার কাদায় বা কনকনে শীতে ছুটতে গিয়ে একথা কি তার মনে পড়ে ? একথা কি তার মনে পড়ে যখন ভাড়া-করা রিক্সার চাকায় চাকায় সে তেল দেয়, গদিটাকে ঝেড়ে আবার বসিয়ে দেয়, হাই-ড্রেনের জল কৌটো ভ'রে চাকার রবারে ছিটোয় ? রাতে যখন ঐ রিক্সার গদীতেই মাথা এলিয়ে শুয়ে পড়ে, তখন কি সে তৃপ্ত, ট্যাকের পয়সায় মস্‌গুল, না, শরীরের রগে রগে কট্‌কটে বেদনায় বিকৃত ? ঠোঙায় সযত্নে তুলে ধরা দুখানা মাছিপড়া জিলিপী খেতে সে যে অমৃতস্বাদ পায় তার জীবনে তা কতটুকু বা কতখানি ?......

প্রতিবেশী দীনবন্ধুবাবু তাঁর ছেলেকে কোলে নিয়ে উন্মত্তের মতো আদর কর্‌ছেন। ছেলেটা দীনবন্ধুবাবুর মতোই

আবলুস্, খাঁদা নাক আর নির্মম বিধাতার কৃপায় কিঞ্চিৎ ট্যারা। স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ নয়। আদরের আবেগে শিশুর নাকের নীচে খানিকটা পরিত্যজ্য বস্তু গড়াচ্ছে, দীনবন্ধুর খেয়াল নেই। আদর করছেন।

দীনবন্ধুর নিজের স্বাস্থ্য মন্দ নয়, স্ত্রীর রং শুনেছি ফর্সাই কিন্তু চিররুগ্না, আরও শুনেছি, সুখী দম্পতি। সপ্তাহে একদিন সিনেমা দেখতে চেষ্টা করেন এবং কৃতজ্ঞা স্ত্রী ইনিয়ে বিনিয়ে স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কি ভাবে 'নিজে' (মানে স্বামী) জোড়া টিকিট করে আনেন তা বলেন এবং জহর গাঙ্গুলী শেষটায় পদ্মা দেবীকে কি করলে তা রসিয়ে রসিয়ে বলেন। দাম্পত্যসুখ একেবারে উপচে পড়তে চায়। পড়শীদিদিকে উদ্দেশ করে বলেন, আমি মিষ্টি খাব না, কিন্তু এক ঠোঙা খাবার রোজ আনা চাই! খাও না, অর্ডার দেওয়া ভীম নাগ। বলেন, এ আর কি খাচ্ছ, কাজটা আগে হাসিল করি—তোমায় বাদাম পেস্তার ওপর রাখব। তারপর কি ঝলকে ঝলকে হাসি যেন টিউবারকিউলার লাঙস্ রাপচার করেছে।

দীনবন্ধুবাবু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, প্রথমবারের কথা ভগবান জানেন, দ্বিতীয় বার দাঁত ওঠার পর থেকে কোন দিনও দন্তরুচিকৌমুদীতে কোনরকম সংস্কারের হাত পড়েছে কিনা সন্দেহ, শতহস্তেন-ই একমাত্র উল্টির রক্ষাকবচ, ওতে পান আছে, ভীমনাগের সন্দেশ আছে, রোহিত মৎস্য আছে, চিংড়ির কাট্‌লেট আছে, দু'পয়সার তেলেভাজা আছে,

পুডিং আছে। কিন্তু গায়ে সাবান দেন, মট্‌কার জামা চড়ান, ডাইং ক্লিনিংয়ের আর্জেণ্ট ধোয়া কাপড় জড়ান, লেটেষ্ট ফ্যাসানের সিগারেট খান। দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী খাস কল্‌কাতার কুলীন কায়স্থের মেয়ে, পিতা লক্ষ্মীর দরগায় এত সিন্নী দিয়েছেন যে মেয়েকে প্রাইমারী স্কুলের ওমুখো হতে দেননি। কিন্তু কল্‌কাতার মেয়ে জানে না কি ?

অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীর গয়না নিয়ে দীনবন্ধু একবার ভাগলপুর গেছলেন। খবরের কাগজে সাড়ে তিন টাকা ইঙ্গিতে 'ফিরে এস' আবেদন জানিয়েও নিরুদ্দিষ্টের খোঁজ মেলে নাই ; তারপর ছ'মাস পর ভিখিরী শিব যখন এসে দাঁড়ালেন, তখন পতিব্রতা সতী চোখের জল ফেলে বল্‌লেন, তুমি এসেছ এই ঢের। গয়নার কথাটা একসপ্তাহ মূলতুবী রইল। সপ্তাহ পরে ঝড় উঠ্‌ল।

দীনবন্ধু শপথ করে বলেন, মাগের গয়না খাবেন, তেমন বাপ তাঁকে জন্ম দেন নি ; 'আগে তোমার পাওনার দ্বিগুণ মেটাবো তারপর আমার'.. বলে ছেঁড়া জামাটা তুলে নিয়ে বাটার দুটাকা পনের আনায় পা ঢুকিয়ে বেরোন। পেটেণ্ট ওষুধে চোরাবাজার করে প্রথম টাকাটাই মিষ্টান্নভাণ্ডার আর বীণা সিনেমায় গেল।

পড়শীর কানে বর্ষা ঋতু সুরু হল—প্রবল ; জহর, কানন, ছবি, পদ্মা···নোন্‌তা আর ছানার জিলিপী। সুখী দম্পতি। হুলুস্থুল করে রেশনিংয়ের দিনে পাঁচজন ডেকে ছেলের জন্মদিন। সুখী দম্পতি।

বাড়ীতে ঢুক্তেই শুনি দোতলার ঝি কাঁদুনির সুরে আমার স্ত্রীকে বলছে, মিন্ষে বেঁচে থাকতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে, আজ আমি জ্বলে পুড়ে মরছি মা। আমি বল্তাম, ছি, তিনি তোমার মা, তিনি তোমায় পেটে ধরেছেন, তাঁর মতো গুরুজন কি আছে! তাঁকে অমান্যি ছি! কি বল্ব মা, একথা বললে ক্ষেপে উঠত, বল্ত, তুমি কি আমার স্ত্রী নও, মা হলেই কি তোমায় যাচ্ছেতাই করবে নাকি, ইস্ত্রীর সম্মান আমি দেব। শাশুড়ীর পায়ে পড়ে বল্তাম, ওর অপরাধ নেবেন না, মা। ওকে আপনি পেটে ধরেছেন। ওমা তাতে মাগী বল্ত কি, পেটে যে আমি ধরেছি সে কি তুই মনে করিয়ে দিবি হারামজাদী···এরই মধ্যে কোথায় যে সে থাকত—একেবারে রুখে আস্ত···

বোধ হয় আমাকে দেখে ফেলেছিল, থম্কে গেল; ফিস্ ফিস্ করে কি বলে সরে পড়ল।

স্ত্রী এসে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। মিন্ষের স্মৃতি জেগেছে, হাস্তে হাস্তে বল্লেন, নবনের মার কাছে শুনেছি, বেঁচে থাকতে মিন্ষের হাড়মাস এক করে ছেড়েছে। আবার হাস্তে লাগলেন।

আমাকে পেয়ে কি আমার স্ত্রী সুখী? এ হাসিতে কি তারই ইঙ্গিত, অপরের সুখের কথায় ঠাট্টা; কিসে কি পেয়ে সুখী জান্তে ইচ্ছে করে। সংসারের খিটিমিটি আর দড়ি-কলসীর মাঝে কি তৃপ্তির একটা পাৎলা পর্দা আছে নাকি?

খেতে বসে গতিকে চেপে ধর্লাম। গতি আমার চাকর।

কি গতি, ইস্ত্রীর ওপর রাগ গেছে ?

রাগ কি বাবু, পরিষ্কার জলের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, জলটা বদ্‌লে দি, কি একটা ময়লা দেখাচ্ছে।

জলটা বদ্‌লে দিতেই বল্‌লাম, না, এবার রাগ করেই বাড়ী থেকে এলে কিনা ?

এবার গতি ঘরের চৌকাঠে বসে পড়ল। না, ওর মেজাজটা ঐ এক ধরণের। নইলে যত্নআত্তি খুব করে।

আহা, তা করবে বৈকি, তোমার ইস্ত্রী।

হ্যাঁ, আমাদের তো বাবু ভদ্দর লোকের মত নয়, ছোটলোক আর বলে কেন, ঝগড়াঝাটি 'আমাদের একটু হয়েই থাকে। তাও জানি বাবু, ছেলেবেলায় ওর মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে ওর ঠাকমা। সে আহ্লাদ সোয়ামীর ঘরে খাটবে কেনে ? নইলে, সংসারে কুটোটি আমার নাড়তে হয় না। উদয়াস্ত কি পরিশ্রমই করতে পারে, ইস্।

স্বাস্থ্য কেমন ?

বেশ স্বাস্থ্য বাবু ; বেশ শরীল, সবই ভাল, কেবল ঐ যা··· তাও খড়ের গাদার মতো, দপ করে জ্বলে বটে নেভেও দপ করে।

আগুন ছড়ায় না, কি বল ?

না। ওঃ যাঃ, বাবুর আঁচাবার জলই দিইনি।···

স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন। ফেটে পড়তে চাইছেন হাসিতে।

পরদিন সকালে। খেতে বসেছি। গতি এসে নীরবে দাঁড়ালো।

বাবু, একটা নিবেদন—

বল—বল—

দিন কয় ছুটি যদি দিতেন···একবার···

একবার বাড়ী যাবে ? এই না সেদিন এলে ?

দু'টো দিন বাবু, তিনদিনের দিন এসে পড়ব। হ্যাঁ নিশ্চয়।

বুঝলাম, কাল রাতে গতির ঘুম হয়নি। আরও বুঝলাম, সমাজের গতি এগিয়েও যে বার বার পিছিয়ে যায় তার কারণ, সমাজের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এই সন্তোষকুমারেরা সমাজকে ধারণ করে আছে।

আষাঢ়, ১৩৫৪

হিংসায় সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়ে চম্পাবালা বল্‌লে, ঢং।

বলুক চম্পাবালা। আপনিই বলুন, এই ঢং ছাড়া মানুষের আর কি আছে বলুন? চম্পাবালা বস্তির মেয়ে। অমার্জিত তার ভাষা। নইলে সে এই কথাটাকেই আর একটু ভদ্রস্থ ক'রে বল্‌তে পার্‌ত 'ভঙ্গি'।

আর সত্যি ভঙ্গি ছাড়া কীই বা আছে মানুষের? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, য়্যাটমের অস্তিত্ব তো ধরা-ছোঁয়া যায় না, ওর পরিণতি বা প্রকাশটাই মাত্র ইন্দ্রিয়ের আওতায় বন্দী হয়।

মানুষেরও তাই। আপনি তো সনাতন কাল থেকে একটা অবাস্তব মনকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, হদিস্‌ পেলেন কিছু? পান নি। অথচ এই অগণিত অসংখ্য মানুষের সবাই নাকি এক একটা মনের অধিকারী। যে একেবারেই অবাস্তব হ'য়ে রইল তাকে নিয়ে ব্যবহারিক কারবার চলে কেমন ক'রে, বলুন তো আপনি?

এর সবটাই কি কূটনীতি, মানে অভিনয়? আসল বস্তুটি কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না?

এমন উপসংহার নিতান্তই বাড়াবাড়ি।

নইলে দেখুন একবার তাকিয়ে ঐ সুজাতা নন্দীর দিকে। হ্যাঁ, তিনিই সৌভ্রাত্র সম্মেলনের উদ্গাতা, উদ্যোক্তা, প্রাণস্বরূপা।

জানি সুজাতা নন্দীর যৌবন একদিন ছিল, সেই যৌবনের

জোরে একটা তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে ঝুলেও পড়েছিলেন। বিদেশী মাটীর রেঁদেভু সনাতনী না হোক আদালতী পাণিপীড়নে পাকাও হ'য়েছিল। তারপরই তেম্‌নি অকস্মাৎ তিনি একদিন তাঁর যৌবনের তরণীখানি একটা টাকার কুমীরকে তলিয়ে নিতে দিলেন। তারও পর একদিন যখন ভেসে উঠ্‌লেন তখন কি একটা সেবায়তনে নিজেকে ভেড়ালেন। মধুকরেরা অবশ্যই আবার গুঞ্জন তুল্‌ল এবং একদিন মহাসমারোহে সুজাতা নন্দী নিজেকে প্রকাশ করে দিলেন সৌভ্রাত্র সম্মেলনে।

আজ এই অসমাপ্ত-বিক্ষিপ্ত কাহিনীর এক একটা ভঙ্গি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভাব্‌তে কত কৌতুক জাগে।

সুজাতা নন্দী উর্বশীর মতোই একেবারে যৌবন নিয়ে দেখা দিলেন। তিনি অবোধ শিশুর মতো কখনো মূক ছিলেন, নগ্নদেহে ছিন্নকন্থায় পূরীষ কলুষিত হ'য়ে কোনদিন কঁকিয়েছেন, অথবা ফ্রক পরে তেতাল্লিশ টাকা কেরানীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাকের মিউকাস মুছে নিয়েছেন একথা কারও মনে জাগেনি, জাগ্‌তে পারেনি। অথবা সুজাতা নন্দী কখনো······ না, কোন প্রশ্নই জাগেনি, সুজাতা নন্দী সরাসরি যৌবনের ভঙ্গি নিয়েই আশুতোষ বিল্ডিংয়ে আনাগোনা করেছেন।

এই ভঙ্গি তাঁর সর্বাঙ্গে। ব্লাউজের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো কমলা রঙের শাড়ীখানা কাঁধের যেখান থেকে ঘুরে আলতোভাবে বুকের একটা পাশে আধা অনাবৃতির কৌতূহল সঞ্চারিত করেছে সেখান থেকে পায়ে প্রণতির পর হাউই-

বাজীর মতো নিতম্বকে রেখায়িত করে আবার যেখানে ঊর্ধমুখী গোলকধাঁধায় মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সেখান পর্যন্ত যে ভঙ্গির বিদ্যুৎপ্রবাহ তা এক ঐ সুজাতা নন্দীরই নিজস্ব। তিনি জানেন, এই শাড়ীখানা আর এই ব্লাউজখানাই তাঁকে আজ মানাবে, তিনি একদিন এই যমজ কাপড়ের টুকরো অত্যন্ত যত্নে পাট করে চল্লিশ ইঞ্চি শক্ত সুটকেশের ভেতরে রেখেছিলেন, এমন একটা উপলক্ষে অঙ্গাবরণ করবেন বলে, কেবল ন্যাপ্‌থিলিনের বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েই হোক্ বা সুজাতা নন্দীর কুড়িবছরে ক্ষয়ে-যাওয়া যৌবনের মতোই হোক্, পোকায় কাটা শাড়ীর বা ব্লাউজের মেপাক্রিন-পরিমাপের ফুটো দুটো তাঁর চোখে পড়েনি, পড়লে গ্রাহ্য করেন নি বা জেনেশুনেই ওদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। হ্যাঁ, ঐটিই তাঁর ভঙ্গি। ঘরের দেয়ালে টাঙানো আয়নার সম্মুখে এতটুকু একটা র‍্যাকের ওপর ক্রীম, ভেসেলিন আর পাউডার নাড়াচাড়া করার ভেতর সুজাতা নন্দীর প্রত্যেকটা ভঙ্গি উচ্চারিত হয়। প্যাঁচ কষা কৌটোটা খুলতে গিয়ে সুজাতার ডান হাতের বহু অতিক্রান্ত বছরের কর্কশ কয়েকটি আঙুলের যে গতি খেলে যায় সুজাতার ব্যক্তিত্বে তার দান অসামান্য। তারপর আল্‌তো তর্জনীর একটা ছোঁয়াচে, এই এতবড় একটা আদেখলে খাব্‌লা নয়, একটু ভ্যানিসিং ক্রীম, একেবারে হিসেব করা এই এতটুকু, তাঁর কুচকে-আসা লম্বা গালে কপালে নাকে, ঠোঁটের ঠিক আশে পাশে কর্ণলতি পর্যন্ত গিয়ে যখন চর্চা করেন তখন বোঝা যায় সুজাতা নন্দী কি।

সুজাতার পরিচয় তো তখনই ফুটে উঠতে থাকে যখন তিনি সমস্ত মুখটা একটা বিশেষ ছন্দে মুছে আনেন, আর তিন সেকেণ্ডের জন্য একটা লালচে হোরি খেলে যায় তাঁর লম্বা ঝুলে-পড়া মুখে, সুজাতা তেম্‌নি অনায়াসে আটবছর আগেকার মুর তোয়ালেখানা একহাতল চেয়ারের গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। সুজাতা নন্দীর পরিচয় সেখানে যেখানে তিনি অকস্মাৎ পুরী থেকে আনানো সিঁদূরের কৌটো থেকে একটা রক্তবিন্দু তাঁর দুই ভুরুর মাঝামাঝি সিকি ইঞ্চি উঁচুতে এঁকে তোলেন, বিভক্ত কেশদামের সোজা সরু পথে চুলের মতো সরু সসীম লালরেখা লেখেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর হেমাঙ্গিনীর মতো নাকছবি দিয়ে নাসিকা কলঙ্কিত করেন না কিন্তু স্বস্তিকা-মার্কা দুল যে দুল্‌তে থাকে তাঁর দুই কর্ণ-লতিতে সুজাতা নন্দীকে যদি চিনতে হয় তবে সেদিকে তাকাতেই হবে। শেষ বয়সে উঠে যাওয়া চুলের পরিপূরক কালো সূতোর লেছি মাথার পেছনটায় আল্‌গোছে গুছিয়ে রেখে সুমুখের বিবর্ণ চুলে চিরুণী না চালানো দেখলে সুজাতা নন্দীকে দেখা অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে। তারপর হেলেদুলে লেপটানো শাড়ী দেখা, একটু এদিকে একটু ওদিকে টেনে দেয়া আর বারবার আয়নায় মুগ্ধচোখে নিজের চেহারা দেখার মধ্যে একটি কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—সুজাতা, সুজাতা। সেকালের পায়ের আলতা সুজাতা কখনো ঠোঁটে তোলেন নি বটে কিন্তু সুজাতার পায়ে লাল রঙের "শ্রীচরণেষু"র কথা যার মনে নেই সে সুজাতাকে দেখেনি। সুজাতা

আয়নার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসেন, উপহারে পাওয়া আত্মির ছোট্ট রুমালটা মাঝে মাঝে প্রবল আবেগের সঙ্গে নিষ্পেষণ করেন। পরক্ষণেই শিথিল করে দেন, মুক্তি, পৌনে এক ফুটের বেশী নয় এমন করে একটা একটা পা বাড়ান, সর্ব্বাঙ্গে মুদ্রার সৃষ্টি করে স্প্রীংয়ের মতো সিঁড়ি দিয়ে অবতরণকে নৃত্যময় করে তোলেন সুজাতা, যৌবনের কুক্কুরী লালিত্য আজ ক্যারিকেচারে দাঁড়িয়েছে কিন্তু বেঁচে আছেন সুজাতা তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গি নিয়ে। সুজাতা যদি কর্পূরের মতোও উবে যান তবু এই ভঙ্গিমালা দেখেই লোকে বলে উঠতে পারবে সুজাতা নন্দী। কোথায় সুজাতা, যদি ভঙ্গির কাঠামোটা নিঃশেষ হয়, সুজাতা নন্দীর অস্তিত্ব কোথায়, কে চেনে তাকে এই ভঙ্গি যদি অনুপস্থিত থাকে ?

সুজাতা নন্দীকে চেনা যাবে তাঁর কালো কাপড়ের থোঁতামুখো ছাতার বাট ধরা দেখে। ট্রামে ওঠার ঋজু গতি দেখে, ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে আদ্ধেক শরীরটা ভেঙে ছুঁড়িবেকারে উঠতে দেখে, পিয়ানোতে সুর বাঁধা "কেমন আছেন" জিজ্ঞাসায়, "চলি তবে" বলার করুণ বিদায় সঙ্গীতে, আর বিতর্কের আসরে অতি সাধারণ কথা সুজাতার পুনরাবৃত্তিতে অথবা হারীন চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজী কবিতা পাঠকালে অহেতুক কোমর দোলানিতে, সুজাতার অস্থির অতীতকে যা মনে না করিয়েই পারে না। সুজাতা যেদিন প্রথম ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে ঝুলে পড়লেন বা যেবার টাকার কুমীরের টানে নিজের নৌকো তলাতে দিলেন, প্রত্যেকবারই

মিস্ নন্দী স্বজাতীয় প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন, পাণিপীড়নের পরও যে তিনি মিস্ নন্দী রয়ে গেলেন, এইটুকু বাদ দিলে চিনবেন কি করে সুজাতা নন্দীকে বলুন ?

সুজাতা নন্দী গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, অভ্যর্থনার ভার তাঁর ওপর—তিনিই নিয়েছেন। তিনি জানেন, রাস্তার ওপারে পানদোকানের দু'হাত দূরে যে যুবকটি অনবরত সিগারেট টেনে অনর্গল ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে,—তার নিস্পৃহ-মুখবিকৃতির লক্ষ্য যে তিনি তা তিনি জানেন, অভ্যাগতকে অতি সুমিষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, আসুন, সর্বাঙ্গ হেসে ওঠে সুজাতা নন্দীর, মিথ্যা হাসি। অপেক্ষমান যুবকটি অপেক্ষা করতে জানে, জানে হাতের সিগারেটটা কি ভাবে চেপে ধরে টোকা দিয়ে ছাই ফেলতে হয়, আর প্রকৃতির দেয়া সহজ মুখটাকে কি ভাবে নানা রকমে উরুস্তম্ভের বেদনায় বিকৃত করতে হয়, জানে, একটা চোখ নন্দীর দিকে রেখে এক লহমায় দেশলাইয়ের কাঁপানো আগুন ক্যাপষ্টানের সাদা মাথায় ছুঁয়ে দিতে হয়। যুবকটির নাম যে সসীম, তার সঙ্গে তার ভঙ্গির কোন সামঞ্জস্যই হয়তো নেই, আর তাই নিয়েই সসীমের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই সে পারে, সে পারে সাইকেলে হেলান দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চারদিকে সমান সতর্ক দৃষ্টি রেখে অথবা একই জায়গায় অর্জ্জুনের মতো লক্ষ্য ভেদ করে সিগারেট টেনে যেতে! অনর্গল। ভোরে টেক্ ব্রাশের মাথায় ফরহান্স টুথপেষ্ট তুলে নিয়ে বিলোম অনুলোম ভঙ্গিতে দন্তরাজি সমুজ্জ্বল করতে সে জানে, জানে পানের রসে

চূণের ক্যালসিয়ামে স্বাস্থ্য ভাল হ'তে পারে, কিন্তু খয়ের সুপুরির পদচিহ্নে দাঁতকে কৌমুদী ক'রে রাখা দুঃসাধ্য। আর সেই দাঁত নিয়ে "আসুন" বলে ঘেন্নার উদ্রেক করতে— আর যেই পারুক সসীম পারে না, সসীমের অসমান দাঁতের পাটিতে সূর্যের আলো। বাঁ পাশের ক্যানাইন (কুক্কুরী) দাঁতটা একটু বড় আর পাশের দাঁতটার ওপর-পড়া, এই কষ্টে সে বহু রাত বিনিদ্র কাটিয়েছে, বহুবার ভেবেছে যতীন মুখুটির মতো সুমুখের বের করা উঁচু দুপাটি দাঁত নিদেন চীনা ডেন্টিষ্টকে দিয়ে একেবারে উপড়ে ফেলে নূতন করে মানানসই করে নেয়। কিন্তু পারেনি, পিছিয়ে গেছে, দাঁত ওপড়ানোর কথায় তার বড় ভয়। এই ভয়ই তো সসীমের বৈশিষ্ট্য। সে ভয় পায় পুলিশকে, ভয় পায় অন্ধকারকে, ভয় পায় বিরাট সমুদ্রের কথা ভেবে কিন্তু ভয় পায়না পুলিশের চোখ এড়িয়ে অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাইকেলে ঠেঁস দিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকতে। সসীম জানে মল্‌মলের চুড়িদার পাঞ্জাবীর নীচে স্যাণ্ডো হাতা জালি গেঞ্জি কি ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় আর তার পাশে খানিকটা পৌরুষের পেশী। সসীমকে যারা সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করতে দেখেছে, সসীমকে যারা হ্যাঙ্গারে জামা তুলে রাখতে দেখেছে, সসীমকে যারা টেবিলে প্লাষ্টিকব্যাণ্ডে আঁটা সাইমা ঘড়ি রাখতে দেখেছে অথবা যারা ফুটপাথে ভীড়করা ব্রঙ্কোওলাদের কাঠের পৈঠায় কালো নিউকাটাবৃত একটার পর একটা পা বাড়িয়ে দিতে দেখেছে তারা জানে সসীম কি। সসীম কখনো

রেস্তোরাঁয় গিয়ে পিতৃব্যসম বালকের দিকে অথবা টেবিলে কাঁচের নীচে চাপা মেন্যু দেখে তার চাহিদা জানায়নি, রুমালের নামে ছয়-ইঞ্চি ছয়-ইঞ্চি তোয়ালে দিয়ে ঘাড় রগড়াতে রগড়াতে বলে : ফাউল কাটলেট, একপিস পুডিং। 'বালক' চায়ের কথা জিগগেস করলে বলে, স্রেফ এক গেলাস জল। তিনবার সসীমের সাইকেল চুরি গেছে এই স্কোয়্যার কেবিনের সম্মুখে তবু সে তালাচাবি দেবেনা সাইকেলে, তার এই (ষ্টইক ইন্‌ডিফারেন্স) বিগতস্পৃহ ভাব স্কোয়্যার কেবিনের প্রত্যেকটা মক্কেল জানে, জানে বালকেরা, জানে মালিক। সৌভ্রাত্র সম্মেলনের সম্মুখে গোল্ড মেডালিষ্ট ইয়াসিন কোম্পানীর সৌজন্যে সাজানো দারুপত্রাচ্ছাদিত বাঁশের গেটের নীচে স্বাগত সম্ভাষিণী সুজাতা নন্দীর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে সাইকেল ঠেঁস দিয়ে অবিরাম ক্যাপষ্টানের ধোঁয়া ছাড়তে পারে কে—এক সসীম ছাড়া ?

সসীম কল্পনা করতে লাগল : এই সৌভ্রাত্র সম্মেলনকে আশীর্বাদ করতে আসছেন গান্ধীজী। সসীম কেন, লক্ষকোটী ভীড়ের মধ্যেও লক্ষকোটী লোক ওঁকে চিনে ফেলবে।

গান্ধীজী এত সুপরিচিত যে লোকে তাঁর বৈশিষ্ট্য ভুলে গেছে, সম্ভবত ভুলতে বসেছে ওঁর চেহারার বৈশিষ্ট্য, ভুলতে বসেছে ওঁর চলা-বসার ভঙ্গি। চরকা গান্ধীজীর কতটুকু কিন্তু চরকা বাদ দিয়েই বা তিনি কতটুকু ? গান্ধীজী যদি দশফুট লম্বা হতেন, ধরুন গান্ধীজী যদি কৃপালনী হতেন, গান্ধীজী যদি খালি গায়ে না থেকে লংক্লথের পাঞ্জাবী, নতুবা একটা

কোট গায়ে দিতেন, সাদা চাদরের বদলে একটা রঙিন সুজনী জড়াতেন; কাপড়টাকে হাঁটুর ওপরে না রেখে, ঐ মালকোচাটাই আরও নীচে পা পর্যন্ত ছেড়ে দিতেন, ঘড়িটা ট্যাঁকে না ঝুলিয়ে পাঞ্জাবীর ঘড়ি-পকেটে অথবা মনিবন্ধে রাখতেন, পায়ে ডারবি অথবা পম্প পরতেন, কামানো মাথায় যদি একগোছা চুলের চাষ করতেন আর তাই ধানের ক্ষেতের মতো দুদিকে হেলে পড়ত, বলুন তো হলফ করে, চিনতেন গান্ধীজীকে, না, গান্ধীজীর কিছু থাকত ?

গান্ধীজী বাজার চলেছেন, হাতে চটের একটা নোংরা থলি নিয়ে, বাজার করবেন। আলুর দোকানে পচা ছোট জখম আলু বাদ দিয়ে একটা ছোট ভাঙা চুপড়িতে গোটা কয়েক আলু তুলে দিয়ে বললেন, দেড়পো। মাছের দোকানে কাটা মাছে আঙুল লাগিয়ে একবার নাকের কাছে আনতে আনতে বললেন, ভালো তো ?···ভাবতে পারেন ? না, অনায়াসেই ভাবতে পারেন, গান্ধীজী বাঁ হাতখানা মনু গান্ধীর আর ডান হাতখানা আভা গান্ধীর কাঁধে রেখে টক্‌টক্ এগিয়ে আসছেন প্রার্থনা সভায় ? আরও অনায়াসে ভাবতে পারেন গান্ধীজী বাংলাভাষায় তো দূরস্থান মাথা কুটলেও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দেবেন না, দেবেন হিন্দুস্থানীতে, উর্দুতে নয়, হিন্দীতে নয়। হিন্দুস্থানীর দান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শূন্য হোক্, তাকেই গান্ধীজী লিঙোয়া ফ্রাঙ্কা বা হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রভাষা করবেন, এই তাঁর জেদ, এবং এখানেই গান্ধাজী—গান্ধীজী। চেঁচিয়ে সত্য গুপ্তের মতো গলা-ফাটা বক্তৃতা তিনি দেবেন না,

লক্ষ লোকের সাম্‌নে অতি মৃতুকণ্ঠে বিশ্বকে সম্বোধন করবেন।

এলেন গান্ধীজী। সুজাতার সর্বাঙ্গ উচ্চকিত হ'য়ে উঠ্‌ল, সসীমেরও, সুজাতা এগিয়ে যেতেই গান্ধীজী একটা হাত সুজাতার কাঁধে রাখলেন (এই কাঁধে ঠিক এইখানটাই সেই ইঞ্জিনিয়ার, সেই টাকার কুমীর তাদের হাত রেখেছিল ?) সুজাতা সঙ্কোচে গলে গিয়ে সাত বছরের মেয়ের মতো আত্বরে হয়ে উঠ্‌লেন। গান্ধীজীর ট্যান-করা চামড়ায় তাঁর দীর্ঘস্থায়ী গাত্রমার্জনার কথা মনে করিয়ে দেয়, গাত্রমার্জনার সঙ্গে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ নৈকট্য। এ বাদ দিলে কি গান্ধীজী ?

গান্ধীজী এলেন, চেয়ারে নয়, টেবিলের কাছে নয়, ফরাসে, ফুল, তাকিয়া, মাইক্রোফোন পুঞ্জের মাঝে এসে দাঁড়ালেন. হঠাৎ আকাশফাটা গান্ধীজীকী—সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী তাঁর পুরু ঠোঁটে তর্জনী রাখ্‌লেন, চীৎকার বন্ধের জন্য নিজের তুই কানে তুই তর্জনী ঢুকিয়ে দিলেন। এই ভঙ্গি কার ? শ্যামাপ্রসাদের নয়, জওহরলালের নয়, ছাত্রনেতা নিরঞ্জনের নয়।

নিরঞ্জনের কথায় মনে পড়ে গেল। নিরঞ্জনও এসেছে। শুন্‌তেই এসেছে। বসে আছে। কখ্‌খনো সোজা হয়ে মুখো-মুখি বস্‌তে পারে না নিরঞ্জন, কাণ্যি মেরে বস্‌বে। চেয়ারে থেব্‌ড়ে সে বস্‌তে পারে না কখনো, ঐ কেমন একপেশে বসার ভঙ্গি ; চেয়ারের পেছনটায় বা ঘাড়টায় একটা হাত জড়িয়ে রাখে। ট্রামের গদীআঁটা দ্বিবচনী আসনেও সে কোনা মেরে

বস্‌বে, কারো সাধ্য নেই পাশে বসে। পাশে বস্‌লেও বারবার অস্বোয়াস্তিতে নিরঞ্জনের দিকে তাকাতে হবে, সামান্য একটু একটু ঠেলা, কিন্তু নিরঞ্জন নির্বিকার, নিরঞ্জন এমনই উপেক্ষা-ভরে বসে থাকে যে, পাশের লোকটি নিতান্ত বিরক্ত হ'য়েও কিছু বল্‌তে পারে না। নিরঞ্জন মনুষ্য সভ্যতার দুর্বল বৃত্তি বা প্রকৃতিগুলো জানে। তাই সে অত্যন্ত ভীড়ের মধ্যেও একটা টাট্‌কা সিগারেট ধরিয়ে ট্রামে বাসে ওঠে, রেশনের দিনে অনেকের নূতন জামা পুড়িয়ে "সরি" বলে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়্‌তেই তর্ক করে। কিন্তু কাণ্যি মেরে আসনে বসার সময় যদি কেউ তার ডাইংক্লিনিংয়ে আর্জেন্ট কাচা পাঞ্জাবীর কোনায় না দেখে চেপে বসে ছাত্রনেতা নিরঞ্জন ভেতরের অদম্য হিংসা দমন করে মুখে হাসি টেনে বলে: "একটু"—অর্থাৎ, একটু সরে বসুন, জামাটা টেনে নি। লোকটা স্বভাবতই অনিচ্ছা-কৃত অন্যায়ে লজ্জিত হয়ে বলে, ও; নিরঞ্জন তৎক্ষণাৎ বলে না না, বসুন, বলেই আবার এমন হাত-পা ছড়িয়ে বসে যে, অপরাধী বেচারার আগে যেটুকু জায়গাওবা ছিল তা সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসে। নিরঞ্জন জানে লোকটা আর তাকে কিছু বল্‌বে না।

সেই নিরঞ্জন এসেছে। একখানা চেয়ারে এমনভাবে বসেছে যে, উত্তর দিকে বক্তৃতামঞ্চে কি হচ্ছে অথবা পশ্চিম দিককার রাস্তায় কি ঘটছে এ দুয়ের কোন্‌টি সম্বন্ধে নিরঞ্জনের কৌতূহল তা স্থির করা মুস্কিল। যারা বসে আছে নিরঞ্জন তাদের মধ্যে অসাধারণ—ছাত্রনেতা হিসাবে নয়, বসার

ভঙ্গিতে। নিরঞ্জনের ঐতো ধরণ, সে কখ্খনো কারও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। আপনি যদি উত্তর দিক থেকে তাকে অভিবাদন জানান, নিরঞ্জন পশ্চিমদিকে তাকিয়ে বল্‌বে, নমস্কার। তারপর একঘণ্টা ধরে কথা হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, নিরঞ্জন তখনো আপনার মুখের দিকে তাকাবে না। তাইতেই তো চেনে না সে কাউকে, প্রায় কাউকেই না। এমনও হয়েছে নিরঞ্জনের জীবনে যে, সে তার খুড়তুত ভাই প্রিয়রঞ্জনকে হঠাৎ চিন্‌তে পারেনি। কলেজ স্কোয়ারে কে সেজদা ব'লে ডাক্‌ল। এক মুহূর্তে আচম্‌কা তাকিয়ে নিরঞ্জন বল্‌ল, ঠিক···(অর্থাৎ চিন্‌লাম না তো!)—পরিচয় যখন পাওয়া গেল, তখন সে বল্‌ল, ষ্ট্রেঞ্জ (অদ্ভুত!)।

সেই নিরঞ্জন এসেছে। ছাত্রনেতা নিরঞ্জন প্রায় সব সভা-তেই আসে এবং একখানি চিরকুটে তার নাম লিখে কারও হাত দিয়ে সভাপতির কাছে পৌঁছে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরোধও যে, ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সেন কিছু বলতে চায়। ছোট সভাতে প্রায়ই সহজে অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু উঠে সে নির্ঘাত বল্‌বে, সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সে দু'টো কথা বলতে চায়। সে একটা "প্রথমত" দিয়ে সুরু করে কিন্তু দ্বিতীয়ত কি হবে তা জানতে হলে যুগান্ত অপেক্ষা করতে হবে। যে সভাপতি তাকে অনুরোধ করেছিলেন ব'লে শোনা গেছল তিনিই শেষ পর্যন্ত ওকে একরকম টেনে বসিয়ে দেন, নইলে যাদের নিয়ে

সভা সেই মুষ্টিমেয় শ্রোতার মধ্যেও ভাঙ্গন ধরে। নিরঞ্জন গ্রাহ্য করে না। বর্ষা হোক্, কাদা হোক্, রোদ হোক্, নিরঞ্জন শ্রোতাদের সায়েস্তা করতে জানে। সে মাইকটাকে শক্ত হাতে ধরে তিনবার ইন্‌কিলাব আর জয় হিন্দের ধমকে শ্রোতাদের তাতিয়ে তুলে ঘোষণা করে, আপনারা বসে পড়ুন: দুর্ভাগা শ্রোতারা যদি কাদামাটীতে বস্‌তে ইতস্তত করে, তবে সে ইম্ফল রণাঙ্গনে যারা ঘাসমাটী খেয়ে লড়াই করেছিল তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। নিরঞ্জন শ্রোতাদের পলায়ন গ্রাহ্য কর্‌বে কেন? কত কথা বলার আছে, কত কথা লোকে জানে না, নিরঞ্জনকে সে কথা বলতে হবে, লোককে সে কথা শুনতে হবে; ধর্মতলার পিচঢালা পথে নওজোয়ানেরা কলিজার রক্ত ঢালতে পারে আর লোকে দুদণ্ড নিরঞ্জনের মুখে পরাধীন জাতির সংগ্রামের ইতিহাস শুনতে পারবে না? শুনতেই হবে। লোকে শুনেছে স্বাধীনতা লাভের প্রথম চেষ্টা সিপাহীবিদ্রোহ? লোকে জানে কংগ্রেস আগে কেবল আবেদন নিবেদনই কর্‌ত? লোকে জানে নরম-পন্থী গরম-পন্থীর কথা? লোকে জানে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীকে? জানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে, তাঁর অহিংসাকে, তাঁর অসহযোগটাকে, তাঁর হিমালয়প্রমাণ বুদ্ধিবিভ্রাটকে? জানে ১৯৩০? ইত্যাদি ইত্যাদি? জানে আগষ্ট বিপ্লবকে? জানে না।

নিরঞ্জন জানে। নিরঞ্জন জানে, কোথায় করতালির ঝড় তুলতে হয়; যেখানে শ্রোতা বরফ-দেয়া মাছের মতো ঠাণ্ডা

সেখানে গলা ভাঙার ঝুঁকি নিয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে নিরঞ্জন, এও জানে, কিভাবে যোগসাজসে করতালির ঝড় তুলতে হয়। সভাপতির অনুরোধে যেমন সে বক্তৃতা দেয়, শ্রোতাদের মধ্যেও তেম্‌নি সে ভক্ত অনুরক্তের সৃষ্টি করতে জানে। নিরঞ্জন জানে, সংসারে বালখিল্যের অভাব নেই।

সেই নিরঞ্জন এসেছে। পশ্চিমদিকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন লেরিংসে একটা বেদনা বোধ করে; গান্ধীজীর নীরব বক্তৃতার সোচ্চার বঙ্গানুবাদ শুনতে শুনতে বেদনাটা মাঝে মাঝে অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে, নিরঞ্জন অনুভব করে, এর চাইতে সে ভাল বলতে পারত। এ হে হে হে, মাটী করে দিলে এই জায়গাটা মাটী করে দিলে, এই জায়গাটায় চমৎকার একটা অহিংস হুঙ্কার দেওয়া যেত।

গগল্‌স পরে এসেছে নীলিমা, নিরঞ্জন লক্ষ্য করল্‌। কালো গগল্‌স। দশজনের কোন অনুষ্ঠানে আর কাউকে না হোক্‌ নীলিমাকে পাওয়া যেত; এমন অনেকদিন হ'য়েছে যখন বক্তাদের শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করতে গিয়ে একমাত্র নীলিমার দিকে তাকিয়ে বলতে হয়েছে "—এবং ভদ্র-মহিলাগণ!" নীলিমাকে পাওয়া যাবেই প্রগতিশীল অনুষ্ঠানে। নীলিমার গগল্‌সের আড়ালে আঁখি দুটিকে নিরঞ্জন জানে; নীলিমার দৃষ্টিভঙ্গী বাঁকা, চোখ ট্যারা। অসম্ভব তৎপর, অসম্ভব হাস্‌তে পারে, অসম্ভব কথা বল্‌তে পারে, বোধ হয় অসম্ভব মানিয়েও চল্‌তে পারে। বহুবার নিরঞ্জন এড়িয়ে চল্‌তে চেয়েছে, শক্ত কথা বল্‌তে চেয়েছে,

নীলিমা কিছু গায়ে মাখেনি। জওহরলালের "ডিস্কাভারি অব্ ইণ্ডিয়া" বইখানি তুলোতে তুলোতে ঠিক হাজির হবে নীলিমা, ট্যারা চোখে বাঁকা দৃষ্টি খেলে যাবে আর উথ্‌লে উঠবে হাসির ঝলক। নিজেই বেছে নেবে তৎপরতার কাজ, যেমন আজ বেছে নিয়েছে সৌভ্রাত্র সম্মেলনে সমাগত অতিথিদের মধ্যে কর্মসূচী বিতরণের কাজ। কী সহজ গতিতে হল্‌দে রঙের ওপর লাল হরফে ছাপার কর্মসূচীগুলো বাগিয়ে ধরে নরনারীর ভীড়ে আনাগোনা করছে নীলিমা আর ওরই অবসরে ইংরাজীর অধ্যাপক নির্মলের কাছে গিয়ে কোন অজুহাতে একবার আ-মরি ভঙ্গিতে "আহা-হা আমি যেন তাই বল্‌ছি," উচ্চারণ করে ক্ষিপ্রগতিতে কর্মসূচীর তৎপরতায় ফিরে এসেছে।

অথচ অধ্যাপক নির্মল শক্ত কৌপীন আঁটা লোক। লোকে বলে পাঁকালো মাছ। বয়সের সঙ্গে শত্রুতা করে মাথায় যে টাক দেখা দিয়েছে তাতে এই কৌপীনের ছায়া দেখা যায়, সত্যি, কি দুর্মদ শক্তি দেড়ফুটী দু'টুক্‌রো দু ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের। অধ্যাপক নির্মল অবশ্য গৈরিক পরে অধ্যাপনা করতে আসেন না; বাগেরহাটী গেরুয়া খদ্দরের জামা তাঁর একটা চাই, পরণের খদ্দরটাও অবশ্য কাছা দিয়েই পরেন। কিন্তু বাঘা চোখের নীচে দুই পাশের উঁচু চোয়ালে বোঝা যায় তাঁর কৌপীনের কঠোরতা। কামানো গোঁফের নীচে সাধারণ দুখানি ঠোঁটের ফাঁকে এমন উচিত কথা অত সোজা করে কেউ বল্‌তে পারে না অধ্যাপক নির্মলের মতো। ক্লাশে এমন অনেক পরিস্থিতিতে নীলিমার বাঁকা চোখ যখন

ছলছলিয়ে এসেছে পাশের ছেলেরা তখন খলখলিয়ে হেসেছে! ভয়ানক কঠোর অধ্যাপক নির্মল, ক্লাশে মেয়েদেরই বকেন কিন্তু ছাত্রী ছাড়া তিনি গৃহশিক্ষকতা করেন না। অধ্যাপক নির্মল সম্ভবত অবিবাহিত কিন্তু কোন অনুষ্ঠানে কেউ তাঁকে একা আস্‌তে দেখেনি।

তাঁরই পাশে বসে আছেন গাম্ভীর্যের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী। ওরে বাপরে, এ গাম্ভীর্যের পরিচয় একবার পেয়েছে ছাত্রনেতা নিরঞ্জন আর নীলিমা। কি একটা ষড়যন্ত্র মামলা দেখতে গেছল ওরা। গাউন, উইগ নানা সাজপোষাকে একটা দম্‌-আট্‌কানো আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, এরই মধ্যে নীলিমা কি একটা অবান্তর কথা নিরঞ্জনকে বলতে যাচ্ছিল, অকস্মাৎ টেবিলের ওপর হাতুড়ির ঘা আর "অর্ডার-অর্ডার" ঘরটায় গম্‌গম্ করে উঠল। চম্‌কে উঠেছিল নিরঞ্জন, তেম্‌নি নীলিমা। অনেকদিন মনে পড়েছে নিরঞ্জনের আর নীলিমার, আরও কত লোকের কে জানে? বিচারকের মতো বিচারক। সেই শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে সৌভ্রাত্র সম্মেলনে সুজাতা নন্দী আন্‌তে পেরেছেন; শ্রীযুক্ত চৌধুরীও এসেছেন নিতান্ত বাঙালীর মতো গিলেকরা ধুতি আর পাঞ্জাবীর ওপর একখানা মিহি ঘি-রঙের ভাঁজ করা চাদর কাঁধে ফেলে কিন্তু কালো লাঠিটার ওপর ভরকরা আগুম্ফ মুখখানায় তেমনি বজায় আছে জজিয়তি গাম্ভার্য। যেন মুখ থেকে কেবল একটা শব্দই বেরোয় "হুঁ"। তারপরই নির্বিকার ফাঁসীর হুকুম।

সৌভ্রাত্র সম্মেলনের উপসংহার হ'ল। শ্রীযুক্ত চৌধুরীও নিজেকে গুটোলেন। গাম্ভীর্যের ভয়াবহ রূপ এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে রাস্তায় নামলেন, গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ানো আর্দালিকে দেখে দেহভঙ্গিকে আরও কঠিন করে তুললেন, স্প্রীংএর গদী-আঁটা পেছনের মস্ত আসনে নিজেকে একান্ত একক করে তুললেন—ছেলেমেয়ে মিলিয়ে বারোটি সন্তানের পিতা বিচারপতি—শ্রীযুক্ত চৌধুরী। স্রষ্টার বেদীমূলে পঁচিশ বছরের গম্ভীর জীবনের নীরব শ্রদ্ধার্ঘ। বিচারপতির মুখের দিকে তাকিয়ে এই অঙ্ক সমর্থন করবে বা বিচারপতিকে গোপন সৃষ্টিকার্যের নিমিত্তভাগী মনে করবে এমন স্পর্ধা কারো নেই।

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর ডি সোটো এসে থাম্‌ল বাড়ীর গেটে। নাম্‌তে গিয়ে দেহটা কাঁপল, না, পা-টা কাঁপল, বোঝা গেল না, কিন্তু বাঁ পা-টা টান্‌তে গিয়ে শ্রীযুক্ত চৌধুরী যেন একবার নেংচে উঠলেন। একবার তাকালেন নাকি ওপরের দিকে! ড্রয়িংরুমে বাড়ার চাকর হাতের লাঠিটা আগ্‌বাড়িয়ে সংগ্রহ করল। বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন, তুর্বল ফাঁসীর আসামী যেমন ক'রে ফাঁসীমঞ্চে ওঠে। চওড়া সিঁড়ি, একেবারে খাড়া ওঠেনি, যেখানটায় ঘুরে গেছে সেখানেও একটা বিশ্রামের চত্বর, তারপর আবার সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে, তেমনি ধীরে ধীরে।

এদিককার ছুটো সিঁড়ি বাইতেই বজ্রপাত হয়ে গেল। বিচারপতি মুহূর্তের জন্য থামলেন, তারপর আবার তেমনি

সিঁড়ি বাইতে লাগলেন ধীরে ধীরে। গম্ভীর নিষ্করুণ অবিচল বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী।

মিন্‌ষের আসার সময় হল? কিন্তু আসার আগে ঐ হারামজাদাকে বিদেয় করা হয়েছে কিনা জানতে চাই। পঞ্চস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন বারো সন্তানের মা উষসী ওরফে ঘোতনের মা।

গম্ভীর অবিচল বিচারপতি তেমনি ধীরে ধীরে বললেন, কেন, কি হ'ল আবার?

এই—এই—এই এলেন বিচারক আমার বিচার করতে; আমি জানতে চাই, ও চাকর তোমার না আমার?

তোমার।

তবে, ও নচ্ছার এখনও বিদেয় হ'ল না কেন?

নিশ্চয়ই বিদেয় হবে। বিচারপতি কাপড় বদ্‌লাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

বিচারপতি-গিন্নী বারোটি সন্তানের মেদবহুল মা ছুটে সেইদিকে গেলেন, কি, কি বললে?

শ্রীযুক্ত চৌধুরী কোন মতে হাত বাড়িয়ে লুঙ্গিটা টেনে নিলেন, জামাটা টেনে ফেলতেই প্রকাশ হয়ে পড়ল বনেদী কালের বেনিয়ান। বিচারপতি তাঁর বিরাট উইগ আর গাউন পরা অয়েল পেন্টিংটার নীচে এসে দাঁড়ালেন কাঠগড়ার আসামীর মতো। বললেন, বললাম, ও হারামজাদা যাবে।

যাবে নয়, যায়নি কেন এখনো?

তাত জানিনে।

তবে কি আমি জানব? হতচ্ছাড়া বাড়ীর চৌকাঠ পার না হয়ে রয়ে গেল কি তোমার লাঠি ধরতে?

আচ্ছা ওকে এক্ষুণি তাড়াচ্ছি আমি।

নাঃ, ও আর ওপরে আস্‌তে পারবেনা।

বেশ।

বেশ মানে? তবে সংসারের যাবতীয় কাজ কি আমি করব?

তা কেন? অসহায় বিচারপতি বললেন, একটা লোক দেখতে হবে।

দেখতে হবে মানে?—ও বেটা মজা করে নীচে বসে থাকবে, আর যতক্ষণ লোক না ঠিক হয় ততক্ষণ আমি সংসারের দাসীবৃত্তি করি! ওরে আমার বিচারক রে!

তাহলে ততক্ষণ ও হারামজাদাই কাজ করুক। বিচারক করলেন বিচার।

ফেটে পড়লেন বিচারক-গিন্নী! তার মানে আবার ঐ চোরকে ঘরে ঢোকাবে? না, তা হবে না।

তাহলে লোক খুঁজতে বেরোই—বলে শ্রীযুক্ত চৌধুরী নীচের দিকে পা বাড়ালেন।

গিন্নী বললেন, তোমার মতলব আর আমি বুঝি না, ঐ বদ্‌মাসটার ওপর মায়া দেখাতে যাচ্ছ নীচে; নীচে কোথায় চাকর পাচ্ছ? ন্যাকা বোঝাও আমাকে?

তাহলে বল আমিই ওর কাজ করি—বেপরোয়া গাম্ভীর্যের প্রতীক বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী বললেন।

খবরদার!

পাশের ঘরে, বিচারপতির তৃতীয় পুত্রের ঘরে, ডাকাত পড়েছে। পুত্রবধূ জানালার গরাদে ধরে কোন দিকে তাকিয়ে ছিলেন; এমন সময়ে দিনে-দুপুরে ডাকাত পড়ল বিচারপতির তৃতীয় পুত্রের ঘরে। মুখোসপরা বীভৎসাকৃতি ডাকাত রিভলভার উঁচিয়ে বলল, খবরদার।

হুঙ্কারের শব্দে অকস্মাৎ ফিরে পুত্রবধূ চমকে চীৎকার করে ওঠার উপক্রম করতেই ডাকাত ত্রস্তে মুখোস খুলে ফেললে; ডাকাতের ময়লা দাঁত হাসতে লাগল।

বিচারপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরীর তৃতীয় পুত্রবধূ কটাক্ষ হেনে বললেন, ঢং!

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

ভবিষ্যতের আয়না

বেলতলা শিশ্বালয়ের নাম শুনেছেন ? শোনেন নি ? তবে আজ আপনাকে শুনতেই হবে। না, মিছে আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন ; বানানে কিছু ভুল নেই। এই প্রতিষ্ঠানের সদর দরজায়, খোদ বাড়ীটায় যে নাম লেখা আছে, ওদের রাবার মুদ্রায়, ওদের পত্রগ্রন্থে যে নাম আছে তাতে ঠিক এই বানান ! না, তাদেরও ভুল নয়। এই যেমন বাসনালয় (যেখানে বাসন বিক্রী হয়), কমলালয় (যেখানে কমলা ছাড়া আর সব কিছুই বিক্রী হয়), বিদ্যালয় (যেখানে বিদ্যা বিক্রী হয়), শৌণ্ডিকালয় (যেখানে···থাক্ না উহ্য), তেমনি যা নাকি শিশুদের আলয় তাই শিশ্বালয়।

সুতরাং বানান ব্যাকরণ ঠিক আছে। আসলে আপনি চেনেন না ; কিন্তু আজ আপনাকে চিনতেই হবে এবং চিনতেই হবে এমনি লাখো লোককে কালকে যখন সকালে খবরের কাগজে সচিত্র কাহিনী বেরোবে। না, বিজ্ঞাপন নয়, সচিত্র সংবাদ। সংবাদ গবর্ণরের আগমনের আর তার ভাষণের।

আজ গবর্ণর আসছেন, বেলতলা শিশ্বালয়ে আসছেন আমাদের দেশী গবর্ণর, অত্যন্ত লোকপ্রিয়, আজন্ম ভারতীয় কালাআদ্‌মি কিন্তু ইংরাজভাষী ! ভারী লোক-প্রিয়, অতি সহজলভ্য খাঁটি দেশী জননায়ক গবর্ণর।

তিনি আস্‌ছেন ; আসছেন বেলতলা শিশ্বালয়ে, যেখানে

আধুনিক পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়, মানে শুশ্রূষাগার।

নাইরোবি থেকে অভিজ্ঞা হয়ে এসেছেন সুবর্ণময়ী দেবী। স্বামী নাকি সেখানেই মারা যান। কিন্তু স্বামীর নাম অজ্ঞাত ; কেউ জানতে চায় না ; এম্‌নি স্বনামধন্যা সুবর্ণময়ী দেবী তাঁর পরিচিত মহলে। তিনি সুবর্ণময়ী দেবী এর বেশীও নন কমও নন, নাইরোবি-ফেরৎ শিশু-বিশেষজ্ঞা বেলতলার সুবর্ণময়ী দেবী।

প্রাক্‌যুদ্ধকালে সস্তায় একটা পোড়ো বাড়ী, দোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন এই জনবিরল বেলতলায়। তাতেই থাকতেন অত্যন্ত অনুগত এক দূরাত্মীয় পাহারা রেখে। নীচেকার মস্ত নীচু ভিটের স্যাঁতসেঁতে হলটা দেখে শিশ্বালয়ের পরিকল্পনাটা ভ্রূণ আকারে দেখা দিল। তাকেই আদরে আশ্রয়ে পূর্ণতা দিতে নাইরোবি ফেরৎ সুবর্ণময়ী দেবী সেই দূরাত্মীয়কে পাহারা রেখে একখানি আট আনার রুলটানা এক্সারসাইজ খাতা নিয়ে বেরোলেন এবং শিকারী বেড়ালের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে হবু চাঁদাদাতাদের বাড়ীতে বাড়ীতে হানা দিতে লাগলেন।

ফিরে এসে ক্লান্ত কিন্তু আত্মতৃপ্ত দেহে ও মনে নীচেকার স্যাঁতসেঁতে মস্ত হলটা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। ছাদ পর্যন্ত সবুজ কালো শ্যাওলার আস্তরণ, ছাদের কাঠের বীমটায় উইয়ের রেল লাইন, নীচে মেঝের অসংখ্য ফাটলে পরিপক্ক ঘাস বা আগাছা, বাইরের বিপদ থেকে বাঁচবার অগুনতি

ভূগর্ভ সুরঙ্গ ইঁদুরের। ভাঙা কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে উঠ্‌তে গৃহ-সংস্কারের কথা ভাবতে লাগলেন।

বাড়ীওয়ালার নজর নেই, ইচ্ছে ক'রেই নেই, প্রাক্‌যুদ্ধ-কালের চারগুণ ভাড়া বাড়াতে চেয়েছিল; অসামান্য সুবর্ণময়ীর দৃঢ়তায় রেণ্ট-কণ্ট্রোল অফিসে জমা হ'তে লাগল প্রাক্‌যুদ্ধ-কালের ভাড়া।

ভাবনার সিদ্ধিও হ'ল; অদ্ভুত নৈপুণ্য সুবর্ণময়ী দেবীর, অজ্ঞাতনামা মৃত স্বামীর স্বনামধন্যা স্ত্রী সুবর্ণময়ী। কণ্ট্রোলের চুন-সিমেণ্ট পর্যন্ত প্রয়োজনের মাপে নিজের কণ্ট্রোলে আনলেন, ইঁদুর পালাল, উইয়ের রেল লাইন উঠে গেল, ওপরে ওঠার কাঠের সিঁড়িটা পর্যন্ত বার্ণিশ হ'য়ে গেল। জানুয়ারী মাসে ২০টি শিশুকে নিয়ে শিশ্বালয় উদ্বোধন করে আগষ্ট মাসে অর্ধবাৎসরিক অনুষ্ঠান করছেন শিশ্বালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী, পরিচালিকা, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা সুবর্ণময়ীদেবী, নাইরোবি-ফেরৎ সুবর্ণময়ী। স্বাধীন দেশের দেশী গবর্ণর আসছেন। সমস্ত হল-ঘরটা ত্রিবর্ণে রঞ্জিত করিয়েছেন সুবর্ণময়ী, তারই মাঝে মাঝে কি-জানি কেন পাৎলাকাঠের বড় বড় রঙিন প্রজাপতি ও ফুল, গান্ধীজী, নেহরুজী, সর্দারজীর ছবি, কোন একপাশে নেতাজীর ছবি, কি জানি কেন একখানা শিবাজীরও। বেদী আর সিংহাসন ইয়াসিন ডেকরেটরের সৌজন্যে রাজসিক হ'য়ে আছে; একপাশে শিশ্বালয়ের শিশু কয়টি দিদিমণিদের একদিনের অত্যধিক আদর ও ভয়ানক রাগ-চাপা 'এবার কিন্তু রাগ করব'র শাসানিতে অভিভাবক-

দের কাছ থেকে নোটিশ দিয়ে আদায় করা একই রকম পোষাকে চঞ্চল চিত্তের কোমল শরীর ঢেকে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে আছে। বসন্ত-কলঙ্কের ওপর পাউডার-মার্জিত আশা দিদিমণির খানিকটা ট্যারা এক জোড়া চক্ষু উদ্যত হ'য়ে আছে, সুবর্ণদির অনুগ্রহে পাওয়া পঁচিশ আর পাঁচে ত্রিশটাকার শিশুশিক্ষাব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন আশা দিদিমণি। আর এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিযুক্ত অস্থায়ী শিক্ষয়িত্রী রুনু দিদিমণি প্রোগ্রাম নিয়ে ছুটোছুটি করছেন ডানপাশে যেখানে অতিথিবর্গ বসবেন সেখান থেকে লাল শালুপাতা দরজা পর্যন্ত। সাতদিন লেগেছে রুনুর এস্রাজের সঙ্গে টিউন মিলিয়ে বলতে শিখতে 'আসুন', সমস্ত তার বাঁধা থাকা চাই এস্রাজের, তবে এই সুরের ঝঙ্কার পাওয়া যাবে। 'আসুন' অক্ষর কয়টা লেরিংসের সূক্ষ্ম তারগুলি থেকে জন্ম নেবে, সাউণ্ড বক্স থেকে বেরোবে, বড় জিভ আর আলজিভ ছুঁয়ে এসে থামবে ঠিক ম্যাকলিনে মুক্তার মতো মাজা দাঁতের সীমায়, অথচ ঠোঁট জোড়া উঠ্‌বে কেমন চোখা হ'য়ে। 'আসুন', ব্লেডে-কাটা নখহীন হাত জোড়া ঠিক কপাল পর্যন্ত উঠ্‌বে না, থাক্‌বে বুক ও পেটের মাঝামাঝি ছড়ানো প্রোগ্রামসহ, কানের বল-দুল একটু দুল্‌বে।

সুবর্ণদি দাঁড়িয়ে আছেন একেবারে সদরে কলাগাছ আর ডাব কলসীর কাছে, নাইরোবি-ফেরৎ সুবর্ণদি, শুদ্ধাচারিণীর মতো ঘিয়ে রঙের সিল্কের শাড়ী আর ব্লাউজে মুড়ে নিয়েছেন সর্বাঙ্গ, ঠিক আধুনিকাদের মতো বুকের মাঝখান দিয়ে শাড়ী

টেনে অনাবৃত ব্লাউজের হাত ও ঘাড়ের নিজ-হাতে তোলা চিক্‌রি নক্সা দেখাতে নয়। গবর্ণর আসনে।

গবর্ণর আসছেন। ড্যালহৌসী স্কোয়ার এস্‌প্লানেডের সঙ্গমস্থল লাট সাহেবের বাড়ী থেকে বেলতলা লেনের এই শিশ্বালয়ে। রুট ঠিক হ'য়ে গেছে; বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে তো বটেই, গলির মুখে মুখেও ট্রাফিক পুলিশ, লাঠি পুলিশ, বন্দুক পুলিশ, রিভলভার পুলিশ, সাদা পুলিশ।

কৌতূহলী জনতা জান্‌তে চায়। জান্‌তেই হবে। জান্‌তেই হবে পুলিশ কেন মোড়ে মোড়ে। কী ব্যাপার? গবর্ণর যাচ্ছেন। কোথায়? বেলতলা শিশ্বালয়। শিশ্বালয়? হ্যাঁ শিশ্বালয়, বেলতলা লেনের শিশুদের আলয়, শিশ্বালয়। নাইরোবি-ফেরৎ স্বনামধন্যা সুবর্ণময়ী দেবীকে আজকে না জানুন কাল্‌কে জান্‌তেই হবে। আজ এখনই গবর্ণর আসছেন তাঁরই বেলতলা শিশ্বালয়ে, একাধারে প্রতিষ্ঠাত্রী ও অধ্যক্ষা।

কার্জন পার্কের (আজও বঙ্গভঙ্গের কার্জন বেঁচে আছেন, লর্ড কার্জন, কম্‌সেকম ৯০ বিঘা জমি নিয়ে) পশ্চিম উত্তর কোণে লাট-বাড়ীর বিরাট সিংহদ্বারে ফোঁসাচ্ছে লাল সার্জেণ্টের লাল মোটর সাইকেল, লাটসাহেব বেরোলে এর কাজ হবে সামনেওয়ালাকে ভাগ্‌তে বলা, সিংহদ্বারে প্রতীক্ষায় ফোঁসাচ্ছে, লাটপ্রসাদের গাড়ীবারান্দার অদূরে আর এক লাল সার্জেণ্ট লাল মোটর সাইকেল নিয়ে ফুঁসছে, গাড়ীবারান্দায় লাট সাহেবের কালো গাড়ী, তার পেছনের গাড়ীখানি তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের।

সিংহদ্বারের লাল সার্জেন্ট ইঙ্গিত পেয়েছে, ভট্‌ভট্‌ করে ছেড়ে দিল তার লাল মোটর সাইকেল : সাম্‌নেওয়ালা ভাগো। রাস্তা আর গলির মোড়ে মোড়ে পুলিশ হাতছানি দিয়ে মুহূর্তে গতিহীন ক'রে দিল সচল নগরী। লাটসাহেব যাচ্ছেন, যাচ্ছেন বেলতলার শিশ্বালয়ে।

আসছেন বেলতলার শিশ্বালয়ে। বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল নাইরোবি-ফেরৎ স্থবর্ণময়ী দেবীর, মাথায় মুখে ঘাম, বৃহৎ নিতম্বে কম্পন।

লাটসাহেব আসছেন, দেশী লাটসাহেব। অত্যন্ত লোকপ্রিয়, অত্যন্ত স্থলভ, অত্যন্ত সামাজিক : তেমনি মিষ্টি বক্তৃতা, অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর নিষ্ঠা, অকুণ্ঠভাষী অথচ নিরভিমান। লাটসাহেব ব'লে যে সত্যিই 'পান্তালুন' পরে সাহেব হয়েছেন তা নয়; সেই স্যাণ্ডাল (শুধু ছেঁড়া নয় বা আজই সকালে পেরেক মারা হাফসোল দেয়া নয়, অথবা ফিতে লাগানোয় জোড়া সেলাই নেই), থান ধুতি, দোলানো কোঁচাও নয়, মালকোঁচাও নয়, ঐ একরকম কোমরে নাভির কাছে গোঁজা অর্ধেক তোলা পর্দার মতো; হাঁটুর কাছাকাছি এসে পাঞ্জাবীর ঝুল তাকে ঢেকে ফেলেছে, (বহুদিন ধরে মানুষ কাপড় পরে আসছে, সেদিন, আদিম নগ্নদিনের কথা মনে পড়ে?) খুব যে একটা ইস্ত্রী করা তা নয় (তবে সাজো ধোয়াও নয় বা নিজে চার পয়সার সাবানেও কাঁচা নয়), তার ওপর পাট-করা নিরর্থক একখানা চাদর (সিল্ক নয়, বিছানার মার্কিন চাদরও নয়)।

লোকপ্রিয় লাটসাহেব। এমন দিনও গেছে যেদিন তিনি সারা দিনে তিনটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন, না হয় সম্বর্ধনা পেয়েছেন। প্রত্যেক জায়গায় লোকে খুসী হ'য়েছে। একবার ডাক্তারদের এক বাৎসরিক সম্মেলনে গেছ্‌লেন। সেখানে কী চমৎকারই বললেন। একথা বল্‌লেন যে, ডাক্তারি একটা বিজ্ঞান, এ বিজ্ঞান শিখতে হয়, খুব মনোযোগ দিয়ে শিখ্‌তে হয়, মস্ত ঝুঁকি, জীবন মরণ নিয়ে খেলা, মস্ত দায়িত্ব। তাই শিখ্‌তে হবে ; শেখাটাই বড় ; এজন্য কতজন বাঁচল বা কতজন মরল সে হিসাব রাখবে করপোরেশন, ডাক্তারদের কাজ শিখে যাওয়া, মেরে বাঁচিয়ে শিখে যাওয়া, অস্ত্র চালানো শেখা, হাতুড়ের মতো নিঃসংশয়ে ছুরি চালিয়ে যাওয়া। আসলে সত্যিই তো কেউ কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, যদি-না সে বাঁচার জন্যই বেঁচে থাকে, নইলে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিপ্যাথি (কবিরাজী), হাইড্রোপ্যাথি (মানে জলপড়া), সাইকোপ্যাথি (মানে তুক্‌তাক্‌), সব কিছুতেই তো রোগ সারছে। আসলে সবার গোড়ার কথা ন্যাচুরোপ্যাথি (মানে আল্লার নামে ছেড়ে দেওয়া), বাঁচলে বাঁচল মরলে মরবে। এই তত্ত্ব, এই তত্ত্বই ডাক্তারদের শিখতে হবে। জীবনের তত্ত্ব, মূল তত্ত্ব, অনুপ্রাস নয়, খাঁটি চ্যবনপ্রাশ। জীবন অমর, শুধু কেবল নশ্বর জীবনে দৈহিক বেদনা উপশমের মস্ত সেবাব্রত হবে ডাক্তারদের। আপনারা সেই সেবাব্রতী।

থামবার পর, আরে বাপরে, কী অবিরাম করতালি !

একবার মৎস্যব্যবসায়ীদের সম্বর্ধনা সভায় গেছলেন।

বললেন: প্রথমটায় আমি বুঝতেই পারিনি আপনারা আমায় কেন সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন; জীবনে যারা রেলওয়ে সাইডিংয়ে পেটী পেটী মাছকেই সম্বর্ধনা করল তাদের আজ্‌কে আমার মতো একটা মরাও নয়, জলজ্যান্ত মানুষকে, সম্বর্ধনা জানানোর আয়োজন কেন? আমি মৎস্যাশী নই যে, সম্বর্ধনার নামে একটা মস্ত রুইমাছ দিয়ে আমায়, মানে, লাটসাহেবকে খুসী করবেন। ভাব্‌তে ভাব্‌তে অবশ্য সত্য তথ্যটাও উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেল।

বস্তুত, আমরা মাছ ছাড়া আর কি? আমাদের মধ্যে কেউ কুচো চিংড়ি (শুনেছি, কলকাতার আদিম বাড়ীওলারা খুব খায়), কেউ বাগ্‌দা, কেউ গল্‌দা চিংড়ি; আমরা কেউ ভেট্‌কি—বয়সে ছোটবড়, কেউ ভোলা মাছ, কেউ ট্যাংরা, কেউ পার্শে, হ্যাঁ, কেউ রুই, ইলিশ, কেউ জীয়োনো শিং মাগুর কই। আমরা মাছ বৈকি। চিংড়ির মতো অল্পজলে তরপানোর অভ্যাস আমাদের অনেকেরই, খোসাটাই বেশী, অন্তর্বস্তু সামান্য, নয়তো গল্‌দার মতো সর্বত্র পা বাড়ানোর লম্বা ঠ্যাং। কেউ লাটসাহেবের মতো পাকা রুই হ'য়ে বসে আছে, কেউ প্রধানমন্ত্রীর মতো ইলিশ; মাঝে মাঝে এদের দাম নিয়ে গোল বাধে। ইলিশের ভেতর আবার বাঙাল আর অবাঙাল আছে, পদ্মার আর গঙ্গার ইলিশ। জীয়োনো মাছগুলি যেন পুলিশ বিভাগ, মাগুর কমিশনার-ডিপুটী কমিশনার, শিং সশস্ত্র পুলিশ, আর, কই লাঠি পুলিশ। ট্যাংরা মাছ যেন সমাজের গোলমেলে লোক, আর ভোলা মাছ

ভালো লোক। তাই বলছিলাম, আপনারা ঠিক করেছেন, আমাকে ঠিকই ঠাওরেছেন, আপনারা সম্বর্ধনার আয়োজন করেছেন আমার, একটা রুই মাছের। তবে দোহাই আপনাদের, আমাকে কাট্‌বেন না, পাইকারী দরে আমায় আস্ত বিক্রী করুন।

ওরে বাপ রে কী হাসির তরঙ্গ, বোয়াল মাছের মতো হা করে হাস্‌তে লাগ্‌ল মৎস্যব্যবসায়ীরা। ঐ সভাতেই তারা প্রতিজ্ঞা করল যে, এর পর থেকে ওরা আর মাছ কাটবে না, খদ্দেরের গলা কাটবে।

মারোয়ারী সভার কে-একজন সদস্য এক দোকান খোলার জন্য, খোলার জন্য নয়, উদ্বোধনের জন্য গবর্নরকে 'প্রদর্শনীর' অজুহাতে আমন্ত্রণ করেছিল। একটু প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। সুরুচিবালা এণ্ড পার্টি 'তাসের দেশ' অভিনয় করেছিল।

দেখে শুনে মাইক্রোফোনের কানে কানে গবর্নর বল্‌লেন, প্রদর্শনীটা যেখানে আয়োজন করা হয়েছে সেখানে নেই, প্রদর্শনীটা ঠিক এইখানেই। এই বলে প্যাণ্ডালের নীচে জন-সমাগম দেখিয়ে দিলেন। জনসমাগম হেসে ফেটে পড়ল। হাস্‌তে হাস্‌তে হেলতে দুল্‌তে একসঙ্গে অনেকগুলো রকমারি রুমাল বেরিয়ে এল। ভুর্‌ভুরে গন্ধে হাওয়া ভারী হল, না, হাল্কা হ'ল, বোঝা গেল না।

খাঁটি ইউরোপিয়ান দরজীতে কাটা বিরল সুটের কাপড় দিয়ে তৈরী সুট পরে হাস্‌ছেন সম্প্রতি-শ্রী বি এন্‌ বোস্‌ (ওঁর আসল নাম বিনয়, না, বিমল, না, বিজন, না, বিশ্রী,

জানার উপায় নেই, নারায়ণ, না, নাথ তাও-জানার উপায় নেই)। হাস্ছেন তুহিনিকা হালদার, শাড়ীর মস্‌লিনি স্বচ্ছতায় দেখা যাচ্ছে ব্লাউজে সাঁটা মাখন খাওয়া নিটোল স্বাস্থ্য, ফর্সা রংয়েও ঠোঁটে আর কপোলে লালিমা লাগিয়েছেন। হাসছেন কৈবল্যদায়িনীর ম্যানেজিং ডি………।

গবর্নর বল্‌ছেন, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা আমরা তাস, তাই আমাদের দাসত্বটা অত মানিয়ে গেছল, আর এ দেশটা তাসের। পার্থক্য এই, রঙ্গমঞ্চে যেটা দেখলেন, ওটা অভিনয়, আমাদের এটা অভিনয় নয়; আমাদের মধ্যে হরতন, রুহিতন, ইস্কাবন, চিরাতন—চার বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মালিক পুলিশ কৃষক শ্রমিক, রাজা রাণী গোলাম দশ।

জনসমাগমে হাসি হাসি আর হাসি।

এমনি লোকপ্রিয় গবর্নর। তিনি আসছেন শিশ্বালয়ে। শহরের যত সংবাদপত্রের রিপোর্টার ভীড় জমালো, চেয়ারের অভাবে নিজেরাই চেয়ার বয়ে অথবা এক চেয়ারে দুইজন বসে গেল; মাঝে মাঝে কেউ কেউ সুবর্ণময়ী অথবা তাঁর সহকর্মিণীদের কাছে নানা তথ্য জিজ্ঞেস কর্‌তে লাগল, কালকে কাগজের মস্ত 'ফিচার' হবে, একেবারে নিজস্ব।

এলেন গবর্নর, সবাইকে উঠতে হ'ল, গবর্নরের সঙ্গে সঙ্গে বস্‌তে হ'ল। আবার উঠ্‌তে হ'ল, শিশ্বালয়ের শিশুরা রুনুর পরিচালনায় টিউন-করা স্বায়ত্ত শাসনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে কোরাসে গেয়ে উঠল, বন্দেয়েয়েয়ে য়েয়েয়ে……

পরদিন অন্তত কুড়িটা দৈনিকে "ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত" বলে রকমফের রূপে বেরোল :

শিশুই আগামী মানব সমাজের আয়না

মাতৃসমা শিশু-রাষ্ট্রের প্রতি মানবসন্তান-মণ্ডলীর কর্তব্য

কলিকাতা বেলতলা শিশ্বালয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশপালের ভাষণ

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

"আয়নায় আমরা নিজের রূপ দেখি ; অসুখেও দেখি, সুখেও দেখি। সমাজের রূপটা দেখা যাবে কি করে? সমাজের রূপ দেখা যায় শিশু-মহলে। শিশুইতো আগামী মানব সমাজের আয়না।"

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে বেলতলা শিশ্বালয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ষান্মাষিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

এই প্রতিষ্ঠানটি ছয় মাস পূর্বে নাইরোবি-ফেরৎ শিশু-বিশেষজ্ঞা সুবর্ণময়ী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে আফ্রিকান বেত্রেশরী ও ধম্‌কেশরী প্রথায় শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে শিশুর সংখ্যা দুইশত।

শিশুগণের সুললিত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর প্রদেশপাল তাঁর ভাষণে বলেন, "আমি এই শিশ্বালয়ে এসে যেন শিশু হয়ে গেছি। বস্তুত, আমাকে আবার শিশু হ'তে ইচ্ছে যাচ্ছে, ইচ্ছে যাচ্ছে মায়ের কোলে বসে থাকি। কী অসীম অজ্ঞতা, নিষ্পাপ চিন্তা। আর কি সেকাল ফিরে পাব? আজ আমি বড় হয়েছি। বড় মানে, নিমতলায় একটা পা

দিয়ে রেখেছি, বল হরি হরিবোলের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া চীৎকার শুন্‌তে পাচ্ছি, আর শিশু হবার জো নেই।"

"কিন্তু," প্রদেশপাল বলেন, "শিশুদের যতই দেখছি ততই আমার মনে পড়ছে, আমিও একদিন শিশু ছিলাম। এই শিশুরাও একদিন বড় হবে। আমার কালের শিশুদের মধ্যে একজন গবর্নর হয়েছেন, এইটে প্রত্যক্ষ করতে পাচ্ছি। সেদিন কি আমাতে এই গবর্নরগিরি প্রতিফলিত হয়েছিল? আজকে কি এদের মধ্যে ভবিষ্যতের কিছু আভাষ পাওয়া যাচ্ছে? কোনো ইঙ্গিত? আমরা লড়াই করেছিলাম শাসন ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবে বলে। সে শাসন-ক্ষমতা শিশুরা রক্ষা করবে, শিশুদের রক্ষা করবে শিশুরাষ্ট্র। সমগ্র রাষ্ট্র পরিণত হবে শিশু মহলে, শীষ্‌ মহলে। এখানে স্থবিরের, পক্ককেশের, বয়োবৃদ্ধের স্থান নেই, আজ ভারতের শৈশব। আমরাও আজ এই শীষ্‌ মহলের যাদুস্পর্শে শিশু হয়ে গেছি, ইচ্ছে করে শিশুর মতো যা-তা বলি, মনে হয় চিৎপাৎ শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ি, একটু দাঁত উঠেছে, কারও নরম হাতে কাম্‌ড়ে দি, সাবধান, শিশুকে ছুঁয়ো না। না, এই রাষ্ট্র, এই শিশু রাষ্ট্র, ইংরাজের পরিত্যক্ত এই শিশু-আগার, বেলতলার বৃহত্তর শিশ্বাগার মাত্র। ধন্যবাদ।"

প্রদেশপাল বল্‌তে না বলতেই বঙ্গোপসাগর থেকে একটা ভীষণ করতালির ঝড় উঠে এই শিশ্বাগারকে দলিত মথিত করে গেল।

১৩৫৫, কার্ত্তিক

অথ সৌন্দর্যতত্ত্ব

স্পর্ধা দেখুন !

আয়নার কাছটা কিছুতেই ছাড়্‌তে চায় না। পাক্কা আধ ঘণ্টা ধরে সত্তর-মণি হাতুড়ির ঘায়ে তোব্‌ড়ানো নাকটার দু'পাশে কালো চামড়ার কালো ময়লা ঘষে ঘষে আজ্‌কের পাটভাঙা কেলিকো রুমালটায় দাগ ধরে গেল, আয়নার কাছটা ছেড়ে আস্‌বে না তবু—নাগরিক ভেষজালয়ের, ওরফে প্রাক্তন মেট্রোপলিটান ফার্মাসীর ভেষজ-মিশ্রক ওরফে কম্পাউণ্ডার হীরক নস্কর ওরফে জেলেপাড়ার নুটু।

আলমারী থেকে এক শিশি টুসানল তিন-দোকানে-হয়রাণ খদ্দেরের হাতে দিয়ে এদিকটায় আস্‌তেই দেওয়ালে টাঙানো দেড়-হাতি নির্মল আয়নাটার কাছে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল নাগরিক ভেষজালয়ের ভেষজ-মিশ্রক হীরক নস্কর ওরফে জেলেপাড়ার নুটু।

একবার মুহূর্তের জন্য চিন্‌তেই পার্‌ল না এই অপরূপ চেহারাকে এবং মুহূর্তের মুগ্ধতায় নিশ্চল হ'য়ে গেল তার গতি। সংসারে অসংখ্য চুম্বকী সৌন্দর্যের মধ্যে এই একটি। সোজা খাড়া একেবারে মুখোমুখি কাছাকাছি হ'য়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল হীরক নস্কর নিজেকে, নিজের মাংসালো আবরণটাকে, কঙ্কালের ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ সেখানে অনুপস্থিত। দেখ্‌তে লাগ্‌ল নুটু, বড় ভাল লাগ্‌ল, খুবই ভাল লাগ্‌ল, ভয়ানক, ভয়ানক ভাল লাগ্‌তে লাগ্‌ল নিজেকে।

বিদ্যুৎগতিতে ওপর পকেট থেকে ক্লিপে আঁটা দু'আনার মার্কিণ চিরুণীটা বের করে মুহূর্তে তরোয়ালের মতো বাগিয়ে ধ'রে পরশু স্যালুনে আট আনায় ছাঁটা সুবিন্যস্ত স্বল্পচুলে পাকা নাপিতের হাতে ক্ষুরের মতো সপাৎ সপাৎ ক'রে প্রথম দফায় বার চারেক ছক কাটা জায়গায় জায়গায় নিয়ম মাফিক টেনে দিল। তারপর তাকালো গোয়েন্দার দৃষ্টি হেনে খুঁতের টুঁটি ধরে আন্‌তে; মাথার টিকির কাছে বার বারই গোটা কয়েক চুল বিদ্রোহে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ছে; দ্বিতীয় দফায় চিরুণীর চাবুক দিয়ে মার্‌লে আরও দু'ঘা জেলেপাড়ার নুটু, তারপর নিজেই সমুন্নত হ'য়ে দাঁড়াল।

স্বল্প চুলের সিঁথির নীচে ছয়-আঙ্গুলে চওড়া কপালটায় চোখের দৃষ্টি এল নেমে, কোণাটায় এটা কিসের দাগ? তিন আঙ্গুলের আল্‌তো চাপে বেরিয়ে এল পাট করা কেলিকো রুমাল, ঠেক্‌ল গিয়ে সংশয়ের জঞ্জালে, সকাল বেলাকার পার্ল পাউডারের শতাধিক কণিকা আর কৃষ্ণস্বেদের নরম পিষ্টক মিশ্রণ অনায়াসেই উঠে এল রুমালের চার ভাঁজের এক ভাঁজে। কালো নুটু, জিঘাংসায় উন্মত্ত হ'য়ে চারবার ঘষে নিল জায়গাটা; ময়লার লেশমাত্র নেই, আছে মার্জনার জ্বালা। আবার দাঁড়ালো, রুদ্রবেশে নয়, আবেশে, আলু-চেরা চোখে, চোখাচোখি; তারপর দুই জুলপির নীচু থেকে যথাক্রমে দুইবার বাঁ হাতটা বুলিয়ে নিল সকাল সাতটায় সেভেন-ও-ক্লকে দাঁড়ির খুঁটি ওপড়ানো কামানো গালে এবং দু'বারই এসে থাম্‌ল ভেষজ-মিশ্রকের

চিবুকহীন চিবুকে। জন্মাবধিই জেলেপাড়ার নুটুর সত্তর-মণি হাতুড়ির ঘায়ে তোব্‌ড়ানো নাকের ফুটো দুটোর নীচে পাউরুটীর মতো ফুলে ওঠা পুরু ঠোঁটের তীরেই তার চিবুক হারিয়ে গেছে, খুঁজ্‌তে গিয়ে অধর-পদ্মের নীচেকার পাঁপ্‌ড়িতে হাত লাগে।

অকস্মাৎ উগ্র হিংস্র হ'য়ে উঠ্‌ল নাগরিক ভেষজালয়ের ভেষজ-মিশ্রক শ্রীহীরক নস্কর ওরফে জেলেপাড়ার নুটু। কেলিকোর পাট-করা রুমাল অন্ততঃ ছবার ছবার বারোবার নাসারন্ধ্রের আর উত্তুঙ্গ চোয়ালের মাঝামাঝি পরিচ্ছন্নতার আবেগে ঘষে নিল, তারপর আলু-চেরা চোখ-জোড়া আবার আবেশে ঝিমিয়ে এল, মন্দ কি, মন্দ কি! শুধু মন্দ-নয়, বিরল, শ'য়ে হাজারে লক্ষে একটা মেলে, নুটু, তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর!

এতক্ষণে কানে এল চার দোকানে-হয়রাণ খদ্দের বল্‌ছে, ও মশাই, শুন্‌ছেন, মিনাডেক্স আছে, ও মশাই মিনাডেক্স।

খদ্দেরের ব্যবধানে রাখা উঁচু টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে জিগ্‌গেস করল হীরক নস্কর—কি চাই?

দু'পা পিছু হটে হাত বাড়িয়ে ধর্‌তে চাইল নুটু মিনা-ডেক্সের ডালা-ঠেলা আলমারীটা, কিছুতেই সে পেছন ফেরাতে চায় না, নুটুকে দেখুক একবার লোকটা।

ঐ বিশ্রী কটা রঙের নোংরা লোকটা। ইচ্ছে হয় চুলের মুঠি ধরে মোটা চিরুণী দিয়ে ওর ঐ এলোমেলো চুলগুলোকে বাগ মানিয়ে দি, নয়তো নাপিত ডেকে মাথা মুড়িয়ে একটু

ঘোল ঢেলে দি। কথা বল্‌তে যে দাঁত বেরিয়েছে তাকে নিদেন টেক্‌ ব্রাশে একগাদা কম্‌সেকম ম্যাক্‌লীন পেষ্ট দিয়ে ঘষে দি আর অন্তত সাড়ে তিনদিন না-কামানো মুখটা আর কিছু না হোক দেশী বাট্‌লারে চেঁছে দি। চশমার নীচে অমন বোকা চাউনি চাপা না থাকলে কারও ঢোলা পাঞ্জাবীর হাতায় অত ময়লা জমে ?

নিন্‌ মিনাডেক্স।

লোকটার দিকে আর তাকালও না ভেষজ-মিশ্রক নুটু নস্কর। আজ একমূর্তি মনে পড়্‌ছে বারে বার, আর দেড়-হাতি নির্মল আয়নাটা টান্‌ছে বারে বার। সেখানে আছে···

আবার খদ্দেরের পদধ্বনি শোনা যায়: দেখিনি দেখতে চাইনি করেও নুটু ঘুরে আসে একবার আয়নার কাছটা, একটু লজ্জায় যেন আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌তে চায় মুখখানা···

কি চাই ? ঘুরে এসে খদ্দেরকে জিগগেস করে নুটু।

চাই আর একটু স্বাস্থ্য ; আয়নার সুমুখে দাড়িয়ে ভাবেন মোহাবিষ্ট শ্যামপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রণেন সেন, নগরপালের আপন ভাগিনেয় ও সরবরাহ সচিবের সাক্ষাৎ জামাই। তবু তো লোকে বলে, মিঃ সেন, আপনার এই, না-শীর্ণ, ইংরাজ আমলে যাকে বলত 'শ্লিম', সেই দেহে এই উর্দি যা চমৎকার মানায়, বিরাট্‌ বপুতে তা মানায় না, মানাতে পারে না। মিঃ সেন অবশ্যই তেরবছরের মেয়ের মতো খুসীর চাপল্যে বলেন না, যাঃ, কি অসভ্য, বিব্রতের মতো একটু মৃদু হাস্‌তে হাস্‌তে বলেন, আপনার যত···

আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সেকথা মনে হয়। মনে হয় নিশীথে পার্শ্বশায়িতা স্ত্রীকে এই 'জনমত' জানালে অবৈতনিক আমরণ পারিষদ ঘেণ্টুর মা মুখে পানের রস সামলে বলেছিল, মিছে নয়।

চক্‌চকে ক্রশ বেল্টের দিকে চোখ বুলিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান শ্যামপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রণেন সেন।

হিটলারিয়ান একটিপ নস্যের গোঁফ, সুচিক্কণ নাকের নীচে কৃষ্ণ সমুজ্জল। পুরাতন আমাশয়ের কোটরাগত যুগ্ম নয়নের নীচে গভীর কালিমা হিমানীর পরশেও ব্যর্থ করা যায় না, মুখের কটা রং রক্তাল্পতায় পাণ্ডু, শুষ্ক, নিষ্প্রাণ।

ক্রশ বেল্টে চাপা গাঢ় খাকী রংয়ের ইস্ত্রী করা উর্দির আড়ালে আ-উদর আয়নায় বন্দী হয়েছেন রণেন সেন, পায়ে যেন জগদ্দল গোদ নেমেছে; নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়া দুঃসাধ্য, এই রণেন সেন, শ্যামপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রণেন সেন, নগরপালের আপন ভাগিনেয় রণেন সেন, সরবরাহ সচিবের সাক্ষাৎ জামাই রণেন সেন—নিঃসন্দেহে পৌরুষদীপ্ত রমণী-মোহন—রণেন সেন!

কালো প্লাষ্টিকের এত বড় চ্যাপ্টা গোল ঘড়ির ব্যাণ্ডটা মানিয়েছে চমৎকার হাতের রং-বৈষম্যে। চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছে যায় না রণেন সেনের; ঘড়ির তিনটে সরু-কাঁটা টুকটুক্ করে ঘুরছে, সেকেণ্ডের কাঁটাটা ঘুরে এল একশ আশীবার। চমৎকার রং-বৈষম্য, সেকেণ্ডের কাঁটাটার একশ আশীবার ঘূর্ণাবৃত্তিতেও তা অপরিবর্তনীয় ও প্রোজ্জ্বল; কাঁচা হলুদের ওপর কাজলের দীর্ঘ টিপ।

বাকেলাইট পাউডার কেসটা থেকে পাফ্টা টেনে খাবলা করে কপালে গালে নাকে চিবুকে গলায় ঘাড়ে পার্ল পাউডারের সংযোগ ঘটালেন শ্রীসেন, তারপর বাটার তোয়ালে খানিকটা খানিকটা মিটিয়ে দিয়ে ওল্টানো চুলে পদস্থ পুলিশের চ্যাপ্টা টুপিটা বসিয়ে দিলেন। আ-উদর 'সাবধান' হ'য়ে দাঁড়ালেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীসেন; যাকে বলে য়্যাটেন্সান। রণেন সেন, শ'য়ে হাজারে লক্ষে একটি মেলে, শুধু মন্দ-নয় নয়, বিরল। ২৬৲ টাকায় কেনা বিলিতী জুতো, সকালেই 'ব্রুশ' কালো কুচ্কুচে পালিশ করে গেছে, তাতে স-মোজা পা গলিয়ে দিয়ে ঋজুদেহে দাঁড়ালেন এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সহকারীদের বুকের সিঁড়ি ভাঙ্তে লাগলেন, নীচে নীচে, ক্রমে নীচে, রাস্তায়।

আজ তিনি হেঁটে টহল দেবেন এই মহল্লায়। চামড়ার আশ্রয়ে ঝুল্ছে অগ্নিনালিকা, রণেন সেন হঠাৎ পরিদর্শনে যাবেন ৩নং মহল্লার বেনস্বর জেলেপাড়ায়—যেখানে সাত বছর ধরে আছে নাগরিক ভেষজালয়ের ভেষজ-মিশ্রক হীরক নস্কর ওরফে হুটু আর তার পৌনে আট বছর আগে বিয়ে-করা বৌ ময়না নস্কর, রতিকান্ত রায়ের কারখানায় উৎপন্ন মোট এগারটির অন্যতমা। ময়নার সর্বজ্যেষ্ঠা যমুনা আজও মাছ বেচে নথ নেড়ে আর হাতের গয়না ঝাঁকিয়ে, শ্যাওলা পড়া ঝুড়ির বেতাল পাল্লায় ঘষা বাটখারা দিয়ে আজও বিবর্ণ বাগ্দা চিংড়ি ওজন করে তার বাজার মাৎ করে নিজের মিন্ষেকে থামিয়ে পরের মিন্ষের সঙ্গে ঝগড়া

করে, কপালে সাঁটা ইয়া বড় রাধারাণী টিপ্‌টা ঝক্‌মক্‌ ক'রে ওঠে, শেষ রাত্তিরে কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে অতি যত্নে সাঁটা রাধারাণী টিং, আর সিঁথি বেয়ে চানা সিঁদূরের চওড়া সড়ক টাক আর টাকা বাড়িয়ে চলেছে। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণে মিন্‌ষে যখন মদ খেয়ে রিক্সায় বাড়ীতে পৌঁছোয় তখন সেই রিক্সায়ই যমুনা যায় 'ছবি-মহলে' 'উমার-প্রেম' দেখ্‌তে। দোক্‌তাবিধ্বস্ত দাঁত আর হাজা-খাওয়া হাত-পা না দেখ্‌লে কেবল শাড়ী দেখে বলা যাবে না এ আমাদের বাগদা চিংড়ির যমুনা। পাঁচসিকের সিটে বসে সে কোনদিন সোনারু রতন কর্মকারের স্ত্রী বিন্ধ্যার সঙ্গে নূতন বাড়ী-গাড়ী নিয়ে ঘেন্নায় কথা বলে না—শ্রীপতি হালুইয়ের দ্বিতীয় বৌ সোমেশ্বরীর দিকে ঝুঁকে পড়ে বিন্ধ্যাকে দেখিয়ে বলে 'দেমাকি!' কোনদিন বত্রিশ টাকা সেরে সন্দেশ বেচে সোমেশ্বরীর বুড়ো স্বামী বজ্রলেপ সরবরাহের সরকারী প্রাচীর অনায়াসে ফুটো করে কি কৌশলে ক'খানা বাড়ী তুল্‌ল সোমেশ্বরীর সে গল্প কানে না তুলে সোনারু বৌয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে 'অংখার।'

যমুনার বোন ময়না ভেষজ মিশ্রকের বৌ হবার ছ'বছর পর থেকে আর বোনে বোনে দেখা নেই, ময়না আর যাই করুক নথ দুলিয়ে মাছ তো বেচে না। তাই সে পা ছড়িয়ে দিয়ে বিনুনী বাঁধ্‌তে বসে বিকেলের কলে জল এলেই—একদিনও ভুল হয় না ময়নার; চৌবাচ্চায় কলের জলে ছপ্‌-ছপানি শুনতেই বারো ভাড়াটে বাড়ীর স্নানাগারে সে সব্বার

আগে সাবান, ধুঁদুলের খোসা নিয়ে যাবে, মাখ্‌বে খপ্‌করে মুখে একটু তেল, তারপর বাইরের তাগিদে ঝগড়া না ক'রে সে বাইরে আস্‌বে না, স্নানাগারের ভেজা কাপড়ের নীচে লালটকটকে গামছাটার দিকে লোকের ঠিক্‌রানো চোখ উপেক্ষা করে সে চলে আসে তার ঘরে—একতলার সব্বার কোণের ঘরে। 'সাবান তরল আলতা চাই, মাথার কাঁটা ফিতে চাই' কতবার এসেছে এই বারো ভাড়াটে বাড়ীর দুয়ারে দুপুর বেলায়, আর মেয়েরা ভীড় করে দাঁড়াবে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে কিন্‌বেই কিছু একটা ভেষজ মিশ্রকের বৌ ঐ কোণের ঘরের ময়না।

সাপের মতো বিনুনীর লেজটা বার বার বুকের ওপর টেনে এনে দেখে ময়না, কোমর ছাড়িয়ে কতটা গেছে ভৃঙ্গরাজের চূর্ণকুন্তল, তাই টেনে দেখে, তারপর আধুনিক 'খসে পড়ল' 'খসে পড়ল' খোঁপায় দুই থাব্‌ড়া মেরে চক্‌চকে মুখখানা নিয়ে তাকায় মহরমে কেনা চারিদিকের কাঠের ফ্রেমে রঙিন কাঁচ বসানো আয়নার দিকে। ভেজা গামছা দিয়ে রগড়ে তুলে ফেলতে চায় চক্‌চকে ত্বক, কাগজের বাক্স খুলে বের করে জিতেন কোম্পানীর অপস্থয়মাণ শ্বেতপিষ্টক 'হিমাংশু ক্রীমের' সাদা কৌটা ; দাঁতেকাটা নখহীন তর্জনীর স্পর্শে তুলে আনে খানিকটা শ্বেতপিষ্টক, তারপর গোটা মুখটায় ফোঁটা ফোঁটা বসিয়ে দেয় আর মুহূর্তের উন্মত্ততায় ঘষ্‌তে থাকে গোটা মুখটার আনাচে কানাচে ; ভুরুর নীচে চোখ জোড়া লাল হ'য়ে আসে রক্ত চাঞ্চল্যে, আয়না থেকে আর তো চোখ

ফেরাতে পারে না ময়না, নাগরিক ভেষজালয়ের ভেষজ-মিশ্রকের বৌ। বারো ভাড়াটের দেখেছে তো সে সব 'মাগীকেই'; তেতলার রুক্মিনী হালদারের বৌটা নাকি ভারী সুন্দরী, তবু যদি না ওর চোখটা কটা হ'ত! দোতলার শ্যামাঙ্গীর ঐ উঁচু কপাল নিয়েই এত? নিজেই নিজেকে আড় চোখে দেখে নিয়ে নিঃসংশয় হয় ময়না, শ'য়ে হাজারে লক্ষে এমন আর হয় না, শুধু মন্দ-নয় নয়, বিরল।

মহল্লায় টহল দিয়ে ফির্‌ছেন রণেন সেন, শ্যামপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; সহকারীদের আর গৃহস্থের পাঁজরা মাড়িয়ে পদক্ষেপ কর্‌ছেন নগরপালের আপন ভাগিনেয় রণেন সেন। ধরা নয় সরা। কালো প্লাষ্টিক আর হাতের বর্ণ-বৈষম্যের দিকে নজর পড়ে, পদস্থ পুলিশের চ্যাপ্টা টুপিটায় একবার বাঁ হাতটা যায়, ডান হাতটা ঘুরে আসে অগ্নিনালিকার চর্মাশ্রয়ে। ২৬৲ টাকার বিলীতি জুতো জোড়া দেশী মাটির কণিকা চূর্ণ করে চলে—অসামরিক সরবরাহ সচিবের সাক্ষাৎ জামাই রণেন সেন।

তারই বহু পিছে আসছে হীরক নস্করের দুজোড়া নরম কেড্‌স্ু—ট্রামের ভীড়ে পদচিহ্ন আঁকা কালকের সাদারং দেয়া কেড্‌স্ু; সত্তর-মণি হাতুড়ির ঘায়ে তোব্‌ড়ানো নাকের দুইপাশে পাটকরা কেলিকোর রুমাল ঘুরে আসে, ঘুরে আসে বাঁ হাতের আঙুলকটি নাগরিক ভেষজালয়ের ভেষজ-মিশ্রকের চিবুকহীন চিবুকে নয় নীচেকার ঠোঁটের পাঁপড়িতে।

ময়না সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি ফেল্‌ছে আয়নায়

৩নং মহল্লার বেনম্বর জেলেপাড়ায় বারো-ভাড়াটে বাড়ীর একতলার সব্বার কোণের ঘরে।

সন্ধানীদৃষ্টি ফেলে আস্‌ছেন শ্যামপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; পুলিশীকোয়ার্টারের লাল বাড়াটার এই ঘরটায় থাকে বড়বাবুর ঝি চাকরেরা; স্বভাববশতঃ সেখানেও দৃষ্টির তীর হান্‌তেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন শ্রীসেন। ঘরের এককোণে কম্‌সেকম বিয়াল্লিশ বছরের হরির মা দেয়ালে ঝোলানো সম্ভবতঃ বিন্ধ্যেশ্বরের আয়নার দিকে মুখখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি দেখ্‌ছে—বাঁ পাশটায় ডান পাশটায়, গা-হাত-পা ধুয়েই বোধ হয় এসেছে। এসেছে শুক্‌না একখানা ফর্সা থান পরে, সেই শুকনো থানের আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে ঠোঁটের কোণা দুটো টেনে টেনে মুছ্‌ল—শিথিল ঢিলে চামড়ার কি চাঞ্চল্য জাগ্‌ল কে জানে, তড়িৎগতিতে বিয়াল্লিশ বছরের হরির মা সম্ভবতঃ বিন্ধ্যেশ্বরেরই পাউডার খানিকটা···ওপরে ডাক পড়েছে হরির মার, কানেও যায় না হরির মার, আয়নার কাছটা ছেড়ে সে কিছুতেই যেতে চায় না, দেখছেন কাণ্ডটা?

ওপরে সিঁড়ি ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে আপন মনেই বলেন রণেন সেন, স্পর্ধা!

লেখকের অন্যান্য বই :—

ফাঁসীর আশীর্বাদ (১৯২৯ প্রথম প্রকাশ ও ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত) দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৪৮, স্বাধীনতার পর, সুলভ সংস্করণ মূল্য ১॥ টাকা।

…সমাজের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাবে বিপ্লব আন্দোলনের আবির্ভাব অপরিহার্য হইয়া পড়ে, সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণসহ যুক্তি ও যোগ্যতার সহিত তাহাও আলোচিত হইয়াছে·

……**আনন্দ বাজার পত্রিকা**

বাংলার নয়, সভ্যতার সঙ্কট (১৯৫১, জানুয়ারী) মূল্য ॥০ আনা।

আজিকার বাঙালীর সমস্যা এবং বাংলার জনগণের মনোভাব………ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট বিশ্লেষণ করা হইয়াছে নূতন দৃষ্টি ভঙ্গিতে……

যুগান্তর

আচরণবাদ (১৯৪২)— } পুনর্মুদ্রিত হয় নাই
বলশেভিকী সঙ্কল্প (১৯৩২)— }

বিপ্লব পথে ভারত (১৯২৯) বাজেয়াপ্ত ও অবলুপ্ত

প্রতিভা প্রকাশিকা, ৩১, স্কট লেন, কলিকাতা—৯